ড. রাগিব সারজানি

কুরআন হিফজ করবেন যেভাবে

অনুবাদ
সাদিক ফারহান

কুরআন
হিফজ করবেন যেভাবে

ড. রাগিব সারজানি

কুরআন
হিফজ করবেন যেভাবে

অনুবাদ
সাদিক ফারহান

সম্পাদনা
সদরুল আমীন সাকিব

মাকতাবাতুল হাসান

কুরআন হিফজ করবেন যেভাবে
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২০

প্রকাশক
মাকতাবাতুল হাসান ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৮৭০০৭০৩০
মাদানীনগর মাদরাসা রোড, চিটাগাং রোড, নারায়ণগঞ্জ
০১৬৭৫৩৯৯১১৯
মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত
অনলাইন পরিবেশক :
rokomari.com - niyamahshop.com - wafilife.com
প্রচ্ছদ : হামীম কেফায়েত
ISBN : 978-984-8012-44-4

মুদ্রিত মূল্য : ১৪০ টাকা মাত্র

Quran Hifz Korben Jevabe
By Dr. Ragheb Sergani
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail : rakib1203@gmail.com
Facebook/Maktabahasan www.maktabatulhasan.com

অ র্প ণ

শ্রদ্ধেয়া আম্মাজানের করকমলে; যার অক্লান্ত শ্রম ও অসীম আগ্রহে আমি হাফেজ হতে পেরেছি!

—অনুবাদক

সূচি

পৃষ্ঠা বিষয়

পৃষ্ঠা বিষয়

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন,

‘নিশ্চয় আমিই কুরআন নাজিল করেছি আর আমিই তা হেফাজত করব।’ [সুরা হিজর: ৯]

কুরআন একমাত্র গ্রন্থ, যার হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেছেন। এটি আসমানি প্রতিশ্রুতি। আর ‘আল্লাহ কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।’ [সুরা আলে ইমরান: ৯]

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণে কুরআন সংরক্ষণের বিস্ময়করসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। যেমন তিনি উম্মাহর বহু সন্তানের বুকে কুরআনের ছবি এঁকে দিয়েছেন আর তাকে করেছেন সহজ, এর হিফজকে করেছেন আয়ত্তসাধ্য। ফলে কুরআনের শব্দ আজও সংরক্ষিত, অর্থ সুরক্ষিত এবং কুরআনের আমলি রূপ উম্মাহর মাঝে প্রতিষ্ঠিত।

এমনইভাবে যে ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, সে ভাষা ও তার পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতাও সুরক্ষিত, যে মহান ব্যক্তিত্বের ওপর তা অবতীর্ণ হয়েছিল, তাঁর জীবনচরিতও অবিকৃত, এমনকি যাদের সম্বোধন করে এসেছে ঐশী এ বার্তা, তাদের জীবনেতিহাস পর্যন্ত আমাদের নিকট অযাচিত হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত অবস্থায় বিদ্যমান।

আজ চৌদ্দশত বছর পরেও শত-হাজার-লাখ মুসলিম সন্তান এ গ্রন্থ বুকে ধারণ করে আছে। হাজারো কূটপ্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র, হাজারো যুদ্ধ ও ধ্বংসযজ্ঞ কুরআনের প্রতিরূপকে বিকৃত করতে পারেনি। বস্তুত, কুরআন একটি পরশপাথর—এর সংস্পর্শে যা আসে, যে আসে, সবই দামি ও মর্যাদাবান হয়ে ওঠে।

যে মাসে এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, সে মাস বাকি এগারো মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; যে রাতে এ কুরআন এসেছে, সে রাত অন্যসব রাতের তুলনায় মর্যাদাপূর্ণ; যে নবীর ওপর এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তিনিও সর্বশ্রেষ্ঠ এবং শেষ ও সমগ্র জাহানের দায়িত্বপ্রাপ্ত। এমনকি ইসলামের চৌদ্দশ বছরের সোনালি ইতিহাসে যারা যেকোনোভাবে কুরআনের সংস্পর্শে এসেছে, তারাই সফলকাম হয়েছে—পৌঁছে গেছে মর্যাদার শিখরে...।

দ্বীনি ইলমের সমৃদ্ধি-প্রত্যাশী প্রতিটি ব্যক্তির জন্যই কুরআন ও হাদিসের 'নুসুস' (টেক্সট) মুখস্থ থাকা অত্যন্ত জরুরি বিষয়। হিফজুল কুরআন এবং হিফজুল হাদিস দুটোই এ ক্ষেত্রে সমানভাবে দরকারি। তবে কুরআনুল কারিমের হাফেজ প্রতিটি মানুষ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত 'কুরআন-সংরক্ষণকারী দলের' অন্তর্ভুক্ত হবেন—কারণ, তিনি তাদের এক মহা নিয়ামতে ঋদ্ধ করে এই মূল্যবান গ্রন্থের হাফেজ বানিয়েছেন, তাদের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন আর তাদের পুণ্যের ভাগ করেছেন সমৃদ্ধ; মুমিন জাতিকে নির্দেশ প্রদান করেছেন, তারা যেন তাদের মর্যাদা দান করে, অন্যদের ওপর তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক হাদিসে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন, "আল্লাহ তাআলা এ গ্রন্থের দ্বারা কাউকে সম্মানিত করেন, কাউকে করেন অপদস্থ।"[১]

ড. রাগিব সারজানি বর্তমান সময়ের একজন আলোচিত লেখক; নন্দিত ইতিহাসবিদ। তাঁর মতো বরেণ্য মানুষ এর বৈষয়িক গুরুত্ব অনুধাবন করে শ্রেষ্ঠ হাফেজদের অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগতভাবে গবেষণালব্ধ বিষয়াদির মাধ্যমে বক্ষ্যমাণ পুস্তিকা রচনা করেছেন। পুস্তিকা না বলে একে বরং একটি রুটিন বা কার্যবিধি বলা যায়।

আমি মনে করি, হিফজুল কুরআনে আগ্রহী প্রতিটি ব্যক্তির কুরআনের সাথে এই ছোট্ট পুস্তিকাটি থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত যারা সময় পার করে ফেলেছেন—জাগতিক ব্যস্ততার

---

১. *সহিহ মুসলিম* : ৮১৭।

কারণে আর হিফজের সুযোগটুকু পাচ্ছেন না। যারা কলেজ-ভার্সিটিতে পড়ছেন অথবা যাপিত জীবনের গোলকধাঁধায় এমনভাবে আটকে গেছেন, যেখানে হিফজুল কুরআনের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সাহস করতে পারছেন না—তাদের জন্য পুস্তিকাটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। হিফজুল কুরআনের আদ্যোপান্ত শেষ করতে যতগুলো স্তর অতিক্রম করা প্রয়োজন, যতগুলো রুটিন ও কর্মবিধি প্রস্তুতকরণের দরকার, বইটিতে প্রায় সবই তিনি আলোচনা করেছেন।

লেখক যেহেতু বরেণ্য মানুষ, পাশাপাশি তিনি নিজে একজন হাফেজ, তাই কুরআনের কোন অনুলিপি সংগ্রহ করবেন, কীভাবে কোথা থেকে শুরু করবেন, কতদিন সময় বেঁধে নেবেন, কীভাবে ইয়াদ (স্মরণ) রাখবেন, কোন পর্যায়ের মেধাসম্পন্ন লোকের কী পরিমাণ পড়তে হবে, ব্যস্ততার মাঝেও কীভাবে সময় বের করে নিতে হবে ইত্যাদি—সব বিষয়েই তিনি বিন্যস্ত নীতিমালা প্রস্তুত করে দিয়েছেন, বন্ধুবৎসল শিক্ষকের মতো পরামর্শ দিয়ে বাধিত করেছেন। যে-কোনো

তবে পুস্তিকাটিতে উল্লেখিত আয়াত, হাদিস ও বাণীসমূহের সূত্র উল্লেখ করা ছিল না। তাই অন্বেষণপূর্বক সেগুলোর সূত্র সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, পাশাপাশি শেষে গ্রন্থসূত্রও উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া, যে-সমস্ত কথা ব্যাখ্যামূলকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে, সেখানে তৃতীয় বন্ধনী [ ] ব্যবহার করা হয়েছে।

আমি বলব, ছোট্ট এই পুস্তিকাটি একবার পড়ে সেলফে তুলে রাখার মতো নয়; বরং হিফজ-প্রত্যাশী প্রতিটি ব্যক্তির কুরআনের সাথেই তা থাকা উচিত। বইটি মুসলিম ভাই-বোনদের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাক, এটাই আমাদের কামনা।

ছাপার হরফে আমি একদমই নবীন। এটি আমার অনূদিত প্রথম বই। অতএব, ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া একদম স্বাভাবিক। আশা করি, বইটির কোনো কথায় বা শব্দ ও বাক্যচয়নে কোনো অসংগতি অনুভূত হলে বিজ্ঞ পাঠক আমাদের সে বিষয়ে অবহিত

করবেন। কলেবর ছোট্ট হলেও প্রথম বই হিসেবে কুরআনুল কারিম সংশ্লিষ্ট কাজ করতে পেরে আমি আপ্লুত।

মাকতাবাতুল হাসানের যারা বইটি প্রকাশের পেছনে শ্রম দিয়েছেন, আল্লাহ্ তাদের উত্তম বিনিময় দিন।

পরিশেষে, নন্দিত লেখক ড. রাগিব সারজানির পথনির্দেশে শুরু হোক আপনার হিফজের পথচলা—আমিন।

দোয়ার মুহতাজ
সাদিক ফারহান

প্রাককথন

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর—আমি তাঁর প্রশংসা আদায় করছি, তাঁর নিকট সাহায্য, ক্ষমা এবং হিদায়াত কামনা করছি; তাঁর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি প্রবৃত্তির অনিষ্ট ও আমাদের মন্দ আমলের আগ্রাসন থেকে! তিনি যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ বিপথে নিতে পারে না; আর তিনি যাকে বিপথে রাখেন, তাকে পথে আনার কেউ থাকে না।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক—তাঁর কোনো শরিক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। হে আল্লাহ, আপনার সমস্ত নামের ওসিলা দিয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছি, আপনি কুরআনকে করুন আমাদের হৃদয়ের বসন্ত, অন্তরের আলোক এবং দুশ্চিন্তা-দুর্ভোগ দূরীকরণের মাধ্যম...।

পরকথা,

আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদের যে-সমস্ত নেয়ামত দান করেছেন, তার মাঝে শ্রেষ্ঠতম হলো এই কুরআন। লক্ষ করে দেখুন, মানবকে তার সৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পূর্বে তিনি কুরআন শিক্ষাদানের নেয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন! যেমন সুরা আর-রহমানে তিনি বলেন,

﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ، عَلَّمَ ٱلۡقُرۡءَانَ، خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ﴾

"তিনিই তো রহমান—যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন, সৃষ্টি করেছেন মানবকুল।" [সুরা আর-রহমান: ১-৩]

অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞানহীন মানুষকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন বলতেই যেন অনীহ এবং এই জ্ঞানের অবিদ্যমানতায় সেই মানব তাঁর নিকট নির্জীব জড়পদার্থের মতোই তুচ্ছ...।

এমনইভাবে আল্লাহ তাআলা সুরা আনফালে বলেন,

﴿يَاۤ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ﴾

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সেই ডাকে সাড়া দাও, যা তোমাদের জীবন দান করে।" [সুরা আনফাল: ২৪]

অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ডাকে সাড়া দেয় না যে মানব, সে যেন প্রাণহীন মৃত কোনো জীব।

একদল মানুষকে আল্লাহ তাআলা মহান নেয়ামতে ঋদ্ধ করেছেন—তিনি তাদের এই মহামূল্যবান গ্রন্থের হাফেজ বানিয়েছেন, তিনি তাদের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন, তাদের পুণ্যের ভাগ সমৃদ্ধ করেছেন এবং মুমিন জাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন তাদের মর্যাদা দান করে এবং অন্যদের তুলনায় তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করে। একাধিক হাদিসে বিষয়টির কথা এসেছে। যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা এ গ্রন্থের মাধ্যমে কাউকে করেন সম্মানিত, কাউকে করেন অপদস্থ।"[২]

এ ছোট্ট বইটিতে আমরা এমন কিছু নির্দেশনা উপস্থাপন করব, যেগুলো হিফজুল কুরআনের গুরুদায়িত্ব পালনে আপনার সহায়ক হবে বলে আমরা আশাবাদী। সে উদ্দেশ্যে এখানে প্রথমে আমরা প্রধান প্রধান দশটি মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব—বস্তুত হিফজুল কুরআনে আগ্রহী কেউই সেগুলো থেকে অমুখাপেক্ষী নয়। এরপর কিছু সহায়ক নিয়মনীতি উল্লেখ করব, যেগুলোর গুরুত্ব বিচারে যদিও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তবে তা প্রথম দশটি বিষয়ের

---

[২]. *সহিহ মুসলিম:* ৮১৭।

প্রয়োজনীয়তা মোটেও হ্রাস করে না। অতএব, সর্বসাকুল্যে এখানে আমরা মোট বিশটি উপায়-উপকরণ নিয়ে আলোচনা করব।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের তাঁর কিতাব হিফজের, অর্থ অনুধাবনের এবং তদনুযায়ী আমল করার তওফিক দান করেন। পাশাপাশি তিনি আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা কুরআনের সম্মান রক্ষা করেছেন, তাকে সমুচ্চ করেছেন, তার রঙে রঙিন হয়েছেন; সর্বোপরি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কুরআনের বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেছেন।

তাঁর কাছে আরও কামনা করছি, তিনি যেন এই বইটির মাধ্যমে আমার ও সকল পাঠকের পুণ্যের পাল্লা ভারী করেন! বস্তুত তিনি সকল কিছুতেই সক্ষম, বান্দার ডাকে সাড়া প্রদানকারী!

—ড. রাগিব সারজানি

এই মাহাত্ম্যের খোঁজে

পবিত্র কুরআন হিফজ করা মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলোর অন্যতম। এর মাধ্যমে সবচেয়ে উপকারের বিষয় হচ্ছে, মানুষ তার হিফজকৃত অংশ অনুযায়ী নিজে আমল করতে পারে এবং সে অনুযায়ী অন্য মানুষকেও দাওয়াত দিতে সক্ষম হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿كِتَٰبٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِى صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِۦ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

“আপনার উপর অবতীর্ণ এ গ্রন্থ মানুষকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য; অতএব, এ কাজে আপনার মনে যেন কোনোরূপ সংকোচ না থাকে। আর এ কুরআন মুমিনদের জন্য উপদেশবাণী।”

[সুরা আরাফ: ২]

এই বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবনের জন্য একবার ভেবে দেখুন, নিছক কুরআন তিলাওয়াতকারীর পুণ্যের পরিমাণ কত বিপুল! অতএব, একজন পাঠকের পুণ্যই যখন এত পরিমাণ, তাহলে তা মুখস্থকারী ব্যক্তির মর্যাদা কতটা হতে পারে! কেননা, একজন হিফজ-প্রত্যাশী ব্যক্তি অত্যধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করে থাকে; যেমন সে তার হিফজ দৃঢ় করার উদ্দেশ্যেও ধারাবাহিক তিলাওয়াতে মগ্ন থাকে, আবার ভুলে গেলে সেটুকু পুনরায়ত্ত করার চেষ্টায়ও আত্মনিয়োগ করে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করবে, তার জন্য একটি নেকি রয়েছে। আর প্রত্যেকটি নেকি হয়ে থাকে তার দশ গুণ পরিমাণে। আমি এ কথা বলছি না যে,

‘আলিফ-লাম-মিম’ হলো একটি হরফ; বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মিম একটি হরফ।”[৩]

প্রকৃতপক্ষে, আমাদের দুর্বল মস্তিষ্ক একজন তিলাওয়াতকারীর পুণ্যের পরিমাণই আন্দাজ করতে পারবে না, তাহলে একজন হাফেজে কুরআনের পুণ্যের পরিমাণ কীভাবে অনুধাবন করবে!

তা ছাড়া এই কুরআন কিয়ামত দিবসে ‘সাহিবে কুরআন’ (কুরআনের ধারক)-এর জন্য ঢাল হবে। হ্যাঁ, যিনি জীবন সাজিয়েছিলেন কুরআনের তিলাওয়াত, হিফজ ও তদনুযায়ী আমল দিয়ে, মানুষকে যিনি ডেকেছিলেন কুরআনের দিকে, কুরআন সেদিন তার রক্ষাকবচ হবে। একবার চিন্তা করে দেখুন, কিয়ামতের ভয়াবহ দিবসে কুরআনের প্রতিটি সুরা আপনাকে সেই ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করছে...! এই যে সুরা বাকারা আপনার পক্ষে সুপারিশ করছে, সুরা আলে ইমরান আপনার জন্য আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ জানাচ্ছে, সুরা আরাফ আপনার মুক্তির আবেদনে রত আছে, সুরা আনফাল আপনার হিত কামনা করে যাচ্ছে! কী বিস্ময়ের ব্যাপার চিন্তা করুন! স্বয়ং আল্লাহর কুরআন কিয়ামতের দিন আপনাকে বিভিন্নভাবে রক্ষা করে যাচ্ছে!

যেমন আবু উমামা বাহিলি রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “তোমরা কুরআন পাঠ করো। কারণ, কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীর জন্য সে সুপারিশ করবে। তোমরা দুটি আলোকোজ্জ্বল সুরা তথা সুরা বাকারা এবং সুরা আলে ইমরান তিলাওয়াত করো। কিয়ামতের দিন এ দুটি সুরা দু-খণ্ড ছায়াদানকারী মেঘ বা দুই ঝাঁক উড়ন্ত পাখি হয়ে পাঠকারীর পক্ষে কথা বলবে।”[৪]

---

[৩]. *জামে তিরমিযি*: ২৯১০।
[৪]. *সহিহ মুসলিম*: ৮০৪।

অপার বিস্ময়

সার্বিক দৃষ্টিতে কুরআনুল কারিম হিফজের এই ব্যাপার নিঃসন্দেহে এক মুজেযা বা বিস্ময়কর ব্যাপার। কেননা, আকারে বৃহৎ, শতাধিক সুরার সমষ্টি এবং আয়াতসমূহের পারস্পরিক সাদৃশ্য সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহর লক্ষ লক্ষ সন্তান একে মুখস্থ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে আমি আসমানি বা জাগতিক এমন কোনো গ্রন্থের কথা জানি না, যা এই রীতিতে মুখস্থ করা হয়ে থাকে...। বস্তুত এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর মহান কিতাবকে দেওয়া অনন্য বৈশিষ্ট্য।

আরও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, মুসলমানদের এমন কতক মানুষ এই মহিমান্বিত গ্রন্থ হিফজ করে থাকে, বাহ্যত যাদের দেখে মনেই হবে না যে এরাও কুরআন হিফজ করতে পারে!

দশ না-পেরোনো ছোট্ট শিশু—এমনকি সাত বছরের কম বয়সী বাচ্চারা পর্যন্ত এত বড় কুরআনের হিফজ সম্পন্ন করে ফেলছে! অথচ স্বাভাবিকতই, মুখস্থ-করা অধিকাংশ শব্দের অর্থই [আরবিভাষী হওয়া সত্ত্বেও] এই বাচ্চারা জানে না!!

আপনি নিরক্ষর এমন অনেক ব্যক্তি পাবেন, যারা পড়তে-লিখতে জানে না, কিন্তু কেবল শুনে শুনেই তারা এই কিতাবের হিফজ সম্পন্ন করে ফেলেছে!

এমন অনেক অন্ধ লোক দেখবেন, যাদের দৃষ্টিশক্তির বিনিময়ে আল্লাহ তাদের কুরআন হিফজের নেয়ামত দান করেছেন। কুরআনের পৃষ্ঠা দেখে মুখস্থ করতে না পারলেও মহামহিমের অপার অনুগ্রহে তারা কুরআনকে বুকে ধারণ করে ফেলেছে; বরং ক্ষেত্রবিশেষে সুস্থ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির চেয়েও তাদের হিফজ বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে!

এরচেয়েও বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, যে-সব মানুষ আরবি ভাষাভাষী নয়, তারাও এ কিতাবকে মুখস্থ করে হৃদয়ে ধারণ করে নিচ্ছে! যেভাবে এ কিতাব

অবতীর্ণ হয়েছে, তিলাওয়াত করছে ঠিক সেভাবে পূর্ণ তারতিলের[৫] সাথে; বরং অনেক সময় আরবি ভাষাভাষীদের চেয়েও উৎকৃষ্ট তিলাওয়াত করছে অনারবরা...।

উল্লিখিত বিষয়গুলো প্রমাণ করে, কুরআন হিফজের এ সহজতা হচ্ছে মূলত ঐশী মুজেযা এবং রবের নিদর্শন। বস্তুত মহামহিম প্রভু সত্য বলেছেন,

"আমিই এই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণ করব।"

[সুরা হিজর: ৭]

পৃথিবীতে এ গ্রন্থ সংরক্ষণের শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম হলো, উম্মাহর নারী-পুরুষ ও শিশুদের বক্ষস্থ হৃদয়ের মাধ্যমে একে হেফাজত করার পদ্ধতি। বস্তুত, এ হৃদয়গুলো এমন নিরাপদ সংরক্ষণাগার, যেখানে শত্রু বা বিদ্বেষীগোষ্ঠীর তির পৌঁছার অবকাশ নেই। মুসলমান জাতির ওপর যুদ্ধ এসে কাগজের কুরআন লুপ্ত হয়ে যেতে পারে, কিন্তু উম্মাহর সন্তানদের হৃদয়ে গচ্ছিত কুরআন থেকে যাবে বহাল তবিয়তে। উদাহরণস্বরূপ সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক মুসলিমবিশ্বের দেশগুলো দখল হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। এরা কুরআন পেলেই পুড়িয়ে দিত, কারও ঘরে বা কর্মক্ষেত্রে তা পেলে শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যা করে ফেলত...। এতৎসত্ত্বেও, সে-সব শহরবাসী তাদের হৃদয়ের মাধ্যমে কুরআন সংরক্ষণ করেছে, শুনিয়ে শুনিয়ে একে অপরকে শিক্ষা দিয়ে কুরআন পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করেছে, গোপনে ও গিরি-খন্দকে তারা কুরআনের পাঠদান চালু রেখেছে...। অবশেষে সময় গড়িয়ে একসময় রাশিয়ার জুলুম-অত্যাচার শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু কুরআন রয়ে গেছে মুসলমানের হৃদয়ে ঠিক আগের মতোই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সত্যই বলেছেন :

﴿بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ﴾

"প্রকৃতপক্ষে এ কুরআন এমন নিদর্শনাবলির সমষ্টি, যা জ্ঞানীদের অন্তরে সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট। কেবল জালেমরাই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে থাকে।"
[সুরা আনকাবুত: ৪৯]

---

[৫]. তারতিল, অর্থাৎ হরফসমূহ স্পষ্ট ও ধীরস্থিরভাবে আদায় করা। (সম্পাদক)

জাগ্রত হোক দায়িত্ববোধ

আমি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলতে চাই, কুরআন হিফজ করে হাফেজ হওয়ার সাথে সাথে ব্যক্তির দায়িত্ব বেড়ে যায় বহুগুণ। যাকে আল্লাহ তাআলা এই নিয়ামত দান করেন, তার উপলব্ধি আসা উচিত, কুরআন হিফজের সাথে সাথে তার নবজীবন শুরু হতে যাচ্ছে, কারণ আজ থেকে তার বুকে সংরক্ষিত আছে পবিত্র এক গ্রন্থ। অতএব তার জন্য জরুরি হলো, কুরআন হিফজের পূর্বাপর এক না-রাখা; বরং এই মহান গ্রন্থ হিফজের সাথে সাথে তার ভেতরে বহুমুখী বিপ্লব আসতে হবে। তার ভেতর-বাহির, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, সম্পর্ক ও আচার-আচরণ—মোটকথা সবকিছুতেই ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে।

মনে রাখতে হবে, সে এখন কুরআন বহনকারী এক বিশেষ মানুষ। আর এমন মানুষের ভেতর-বাহির সাজাতে হয় কুরআনের ধারকদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য দিয়ে...।

মহান সাহাবি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, "একজন কুরআনের ধারককে চেনা যাবে তার রাতে—যখন লোকেরা ঘুমে বিভোর; চেনা যাবে তার দিনে—যখন বাকিরা রকমারি আহারে মত্ত; চেনা যাবে তার দুঃখবোধে—যখন মানুষ আনন্দে আত্মহারা; চেনা যাবে তার কান্নায়—যখন লোকে হাসিঠাট্টায় লিপ্ত; চেনা যাবে তার নীরবতায়—যখন লোকেরা গল্পে মজে; চেনা যাবে তার বিনয়ে—যখন বাকিরা ডুবে অহম প্রকাশে...।

একজন কুরআনবাহীর হতে হবে বিনয়ী, নম্র; সে কখনো কঠোর ও কটুভাষী হবে না, কখনো চিৎকার-চেঁচামেচি করবে না বা রূঢ় স্বভাবী হবে না।"[৬]

বিখ্যাত তাবেয়ি হজরত ফুজাইল বিন ইয়াজ রহ. বলেন, "একজন কুরআনের ধারক হচ্ছে মূলত ইসলামের পতাকা বহনকারী ব্যক্তি। অতএব,

---

৬. *ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন:* ২৮৪, *আত-তিবয়ান লিন-নববি* : ৫৪ (শুধু প্রথমাংশ)।

তাঁর জন্য ঠাট্টামশকরাকারী, অনর্থক কাজে লিপ্ত এবং উদাসীন প্রকৃতির লোকের সাথে অংশগ্রহণ-উঠবস করা উচিত নয়!”[৭]

তিনি আরও বলেন, “কুরআনের ধারক যিনি, খলিফা [শাসক] বা এমন কারও কাছে তার কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে না।”[৮]

ইবনে মাসউদ রা. এবং ফুজাইল বিন ইয়াজ রহ. যে বৈশিষ্ট্যগুলোর বিবরণ দিলেন, তাতে স্পষ্ট যে—হিফজুল কুরআন হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ এক প্রকার প্রশিক্ষণ, যা ব্যক্তি ও জাতি গঠনে অবদান রেখে থাকে। আর মুসলিম জাতিতে যদি এমন গুণসংবলিত ব্যক্তিদের আধিক্য সৃষ্টি হয়, তবে সে জাতি হবে নিশ্চিত অমর, অক্ষয়...।

আল্লাহ পাক হাফেজে কুরআনদের মহান এক দায়িত্ব দিয়েছেন, যা মূলত সর্বোৎকৃষ্টদেরই দেওয়া হয়ে থাকে। তারা কুরআন ও তার তাজউইদে (কুরআন পাঠের নিয়মকানুন) দক্ষ হওয়ার কারণে তাদের নিকট ইসলামের সুমহান ইবাদত নামাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

আবু মাসউদ আনসারি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি কুরআন পাঠে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী, সে-ই লোকদের নামাজের ইমামতি করবে। সবাই যদি এ ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের হয়, তবে যে ব্যক্তি সুন্নত [নামাজের বিধিবিধান] সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত, সে ইমামের দায়িত্ব পালন করবে। সুন্নাহর ব্যাপারেও যদি সবাই সমান হয়, তবে হিজরতের ক্ষেত্রে যে অগ্রগামী, সে ইমাম হবে। তারা সবাই এ ক্ষেত্রেও যদি সমপর্যায়ের হয়, তবে যে ব্যক্তি ইসলামের ক্ষেত্রে অগ্রগামী, সে ব্যক্তি নামাজ পড়াবে। আর কেউ যেন কোনো ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীন স্থানে নামাজ না পড়ায় এবং কারও বাড়িতে তার অনুমতি ব্যতীত তার ব্যক্তিগত আসনে না বসে।”[৯]

---

[৭]. *আত-তিবয়ান লিন-নববি* : ৫৫।

[৮]. *আত-তিবইয়ান লিন-নববি* : ৫৫।

—অর্থাৎ যথাসম্ভব দূরে থাকা। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাকে কুরআনের জ্ঞান দানের মাধ্যমে যে দ্বীনি নেতৃত্ব প্রদান করেছেন, শাসক এবং তদশ্রেণীয়দের সঙ্গে উঠবসের ফলে সেই নেতৃত্বের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব কমে আসে। (সম্পাদক)

[৯]. *সহিহ মুসলিম* : ৬৭৩।

উল্লেখ্য, অন্য রেওয়ায়াতে 'ইসলামের ক্ষেত্রে অগ্রগামী'-এর স্থলে 'বয়সে প্রবীণ' বলে বর্ণিত রয়েছে।

এমনইভাবে ইসলাম কুরআনের এ সকল ধারককে অন্যদের উপর প্রাধান্য দিয়েছে ফতোয়া দান এবং পরামর্শ ও মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে। কেননা, আল্লাহ যার হৃদয়কে কুরআনের আলোয় আলোকিত করেছেন, সে বাতিলের বিপরীতে হক এবং ভুলের বিপরীতে সঠিক বিষয় অনুধাবনে অধিক সক্ষম হবে। যেমন হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, "কুরআনের জ্ঞানী প্রবীণ-যুবা নির্বিশেষে উমর রা.-এর সভাসদ এবং উপদেষ্টা হতেন।"[১০]

যুদ্ধ-জিহাদেও হাফেজে কুরআনরা অন্যদের চেয়ে দৃঢ়পদ হয়ে থাকেন। বরং অন্যদের দায়দায়িত্ব বহনের জন্য তাদেরই নির্বাচন করা হয়ে থাকে, তাদের নেতৃত্বেই পরিচালিত হয় সেনাদল। যেমন প্রসিদ্ধ ইয়ামামার যুদ্ধে মুসলমানরা তখন ময়দানে; যখনই মুসলিম শিবিরে বিপর্যয় দেখা দিত, সেনারা তখন 'হে আহলুল কুরআন' বলে ডেকে তাদের কাছে সাহায্য কামনা করতো। তখন কুরআনের হাফেজরা এগিয়ে আসতেন আর তাদের পেছনে অন্যরাও উদ্যমের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতো। এভাবে এক যুদ্ধেই পাঁচশত হাফেজে কুরআন শহিদ হয়ে যান। তাদের শাহাদাতের পর সেনারা 'হে আহলুল বাকারা' বলে কুরআনের ধারকদের সাহায্য চাইতো। অতঃপর তারাও যুদ্ধে লিপ্ত হতেন। এভাবে বহু সংখ্যক কুরআনের ধারক শহিদ হয়ে যান...।

বস্তুত এ ধরনের ঘটনা আমাদের নিকট স্পষ্ট করে, কুরআনের ধারকদের ওপর যুগে যুগে কতটা দায়দায়িত্ব অর্পিত থাকত।

তবে কারও এ কথা বলা সংগত হবে না যে, "এটি অনেক ভারী ও গুরুদায়িত্ব, অতএব শুধু শুধু নিজের কাঁধে এই ভার বহন করার কোনো মানে হয় না...!"

বরং এ ক্ষেত্রে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, ইসলামের প্রতিটি বিধানই মূলত আমাদের দায়িত্বের আওতায় পড়ে। যেমন যুদ্ধ-জিহাদ একটি দায়িত্ব, দাওয়াত একটি দায়িত্ব, এমনইভাবে শাসন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলাও

---

[১০]. *সহিহ বুখারি*: ৪৬৪২।

একেকটি দায়িত্ব। অতএব, মুসলিমরাই যদি শঙ্কিত হয়ে পিছিয়ে পড়ে, তবে এ সকল দায়িত্ব পালন করতে কে এগিয়ে আসবে, বলুন?! তা ছাড়া, সওয়াব ও প্রতিদান নির্ণীত হয় পরিশ্রম অনুসারে; স্বতঃসিদ্ধ বিষয় হচ্ছে, যে ব্যক্তি উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে চেষ্টা-সাধনায় লিপ্ত হয় এবং সেই লক্ষ্যে রাত্রি জাগরণ করে, হতোদ্যম ও অলস ব্যক্তি কখনো তার বরাবর হতে পারে না! বস্তুত, এ ক্ষেত্রে নিয়ত ও কর্মোদ্যমতাই মুখ্য, সফলতার ওপর কোনো কিছু নির্ভর করে না। অন্যদিকে মহান আল্লাহ তো আমাদের সামর্থ্য জানেনই—আর তিনিই আমাদের হিসাবনিকাশ গ্রহণ করবেন। [অতএব ভাবনার কিছু নেই]।

দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা, তিনি আমাদের সকলকে তার দ্বীনের কাজের জন্য কবুল করুন।

ইসলামে হাফেজে কুরআনের মর্যাদা

পূর্বে উল্লেখিত আলোচনাসমূহের মাধ্যমে এটি প্রতিভাত হয়, ইসলামে কুরআন মুখস্থকারী হাফেজদের রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা, আর তা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ কিয়ামত অবধি...।

ইমাম মুসলিম রহ. বর্ণনা করেন, নাফে বিন আবদুল হারেস রা. উসফান নামক স্থানে উমর রা.-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। উমর রা. তাকে মক্কার প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত অঞ্চলের ভার কাকে দিয়ে এসেছেন? তিনি বললেন, ইবনু আবযাকে। উমর রা. জিজ্ঞেস করলেন, এই ইবনু আবযা কে? তিনি (নাফে) বললেন, আমাদের একজন 'মাওলা'[(১১)]। উমর রা.

---

[১১]. 'মাওলা' শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। যেমন আজাদকৃত গোলামকে তার মনিবের দিকে সম্বন্ধ করে অমুকের মাওলা বলা হয়। আবার হালিফকেও মাওলা বলা হয়—হালিফ হচ্ছে, যে দুর্বল ব্যক্তি বা গোত্র কোনো শক্তিশালী, ক্ষমতাবান ব্যক্তি বা গোত্রের সহযোগিতাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে শর্তের ভিত্তিতে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। তখন তাদের সেই শক্তিশালী ব্যক্তি বা গোত্রের দিকে সম্বন্ধ করে পরিচয় প্রদান করা হয়, যেমন কুরাইশ গোত্রের মাওলা/হালিফ।

বললেন, আপনি একজন 'মাওলা'-কে তাদের দায়িত্ব দিয়ে এসেছেন?! নাফে বললেন, সে কুরআন পাঠে প্রাজ্ঞ আর ফারায়েজ (উত্তরাধিকার) শাস্ত্রেও অভিজ্ঞ। তখন উমর রা. বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা এ কিতাবের মাধ্যমে অনেক জাতির মর্যাদা উন্নত করেন আর অনেক জাতিকে অবনত করেন।[১২]

জাবের বিন আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের শহিদদের দুজন দুজন করে এক কাফনে রেখে এক কবরে দাফন করছিলেন; তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন, উভয়ের মাঝে কুরআন কে অধিক জানত? তখন যার দিকে ইঙ্গিত করা হতো, তাঁকে আগে কবরে রাখা হতো।"[১৩]

আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "বয়স্ক মুসলিম, অতিরঞ্জন ও অবহেলা না-করা কুরআনের ধারকবাহক এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাহকে সম্মান করা মূলত আল্লাহ তাআলাকে সম্মান করারই অন্তর্ভুক্ত।"[১৪]

এখানে উমর রা.-এর বিস্ময় প্রকাশের কারণ হলো, মক্কায় সম্ভ্রান্ত কুরাইশরা রয়েছে, কিন্তু তুলনামূলক নিম্নশ্রেণির একজনকে তাদের কর্তৃত্ব দিয়ে আসা হয়েছে। (সম্পাদক)

[১২]. *সহিহ মুসলিম* : ৮১৭।

[১৩]. *সহিহ বুখারি* : ১৩৪৩।

[১৪]. *সুনানে আবু দাউদ* : ৪৮১০।

কুরআন হিফজের ক্ষেত্রে পালনীয় নিয়মনীতি

এ কথা সর্বজ্ঞাত ও সুস্পষ্ট, কুরআনুল কারিম হিফজ করা এমন কোনো সহজসাধ্য বিষয় নয় যে এর পেছনে দীর্ঘ সময় প্রদান ও কষ্ট-মেহনত ছাড়াই যে-কারও পক্ষে তা সম্পন্ন করে ফেলা সম্ভব হবে। যেমন আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট বাণী বিবৃত হয়েছে,

"তোমরা কুরআনের ব্যাপারে যত্নবান হও। যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি—কুরআন [মানুষের মন থেকে] রশিসহ পলায়নপর উটের চেয়েও অধিক বিস্মৃতিময়।"[১৫]

এমনই বর্ণনা মুসনাদে আহমাদেও রয়েছে।

তবে সত্য বলতে, আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলে যেকোনো কঠিন কাজই যে-কারও জন্য সহজ হয়ে উঠতে পারে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট।"

[সুরা তালাক : ৩]

এ ছাড়া ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কিছু চাওয়ার থাকলে, তা আল্লাহ তাআলার নিকটই চাও; কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে, আল্লাহর নিকটই সেই প্রার্থনা জানাও।"[১৬]

পাশাপাশি প্রবাদ বাক্য রয়েছে যে, "হাজার মাইলের পথ—শুরু যে তার প্রথম কদমেই...।"

---

[১৫]. *সহিহ মুসলিম* : ৭৯১।
[১৬]. *জামে তিরমিযি*: ২৫১৬।

এবার আমি এখানে এমন কিছু নিয়মনীতি উপস্থাপন করব, যেগুলো এই মহান কিতাব হিফজ করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ। বিস্তৃত অধ্যয়ন, ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা এবং বিভিন্ন হাফেজের অভিজ্ঞতাসমূহ একত্র করে আমি সেগুলো প্রস্তুত করেছি। কিন্তু তারপরও, এগুলো নিছক একজন মানুষের ভাবনাপ্রসূত বিষয়, ফলে তাতে অবশ্যই বর্ধনের অবকাশ রয়েছে, যে-কেউ এতে হস্তক্ষেপের অধিকার রাখে। অতএব, বিজ্ঞ পাঠকের নিকট আমার আবেদন থাকবে, এই পুস্তিকায় অনুপস্থিত নতুন কোনো পদ্ধতি বা অভিজ্ঞতালব্ধ উপকারী বিষয় যদি আপনার অবগতিতে থাকে, যা হিফজুল কুরআনে সহায়ক হতে পারে, তবে উদারচিত্তে তা জানিয়ে আমাদের বাধিত করবেন—আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা যোগ করে নেবো ইনশাআল্লাহ; পাশাপাশি, এই পদ্ধতির অনুসরণে কোনো নেক আমল সংঘটিত হওয়ার ফলে মহান রবের নিকট তোলা থাকবে আপনার প্রতিদান...।

আমি ভূমিকায় উল্লেখ করে এসেছি, পুস্তিকায় বর্ণিত নিয়মপদ্ধতিগুলো দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা:

প্রথম ভাগে আলোচিত হয়েছে সে-সকল প্রধান নিয়মনীতি, একজন হাফেজের জন্য যেগুলো ব্যতীত গত্যন্তর নেই। তবে আফসোসের বিষয় হচ্ছে, অনেক হাফেজের সাথে কথা বলে দেখেছি, হিফজ এবং ইয়াদের (স্মরণ রাখা) ক্ষেত্রে তারা প্রধান নিয়মগুলো বাদ দিয়ে সহায়ক পদ্ধতিগুলোর ওপরই পুরোপুরি নির্ভর করে থাকে। বস্তুত এটি বোধহীনতা এবং অনুধাবনগত দুর্বলতারই বহিঃপ্রকাশ!

যাই হোক, আমি মনে করি, প্রথম ভাগের এ সমস্ত বিষয় থেকে উদাসীন থাকার কোনো সুযোগ নেই, এগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করা প্রত্যেকের জন্য অবশ্যকর্তব্য!!

আর দ্বিতীয় ভাগে আলোচিত হয়েছে হিফজের ক্ষেত্রে সহায়ক নিয়মগুলো। বস্তুত, স্বস্থানে এগুলো যদিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তবে তাতে যেকোনো ধরনের পরিবর্তন-সংযোজন-বিয়োজন প্রযোজ্য। কারণ, এগুলোর ক্ষেত্রে সময় ও বিভিন্নজনের দৃষ্টিভঙ্গিভেদে সিদ্ধান্ত ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

তবে সারকথা হচ্ছে, প্রধান ও সহায়ক নিয়মনীতি—উভয়টির মাধ্যমেই উপকার লাভ করতে পারলে একটি উত্তম ফলাফলে পৌঁছা সম্ভব হবে নিঃসন্দেহে।

বলে রাখা ভালো, অনেক যুবক হয়তো ভেবে বসে আছেন, আমি এই আলোচনায় তাদের এমন কোনো জাদুমন্ত্র শিখিয়ে দেবো বা পথপন্থা বাতলে দেবো, যা দ্বারা তারা অল্প-কয়েক দিন বা মাসেই সুষ্ঠুভাবে পূর্ণ কুরআনের হিফজ সম্পন্ন করে ফেলতে পারবে! কিন্তু বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই বুঝবেন আশা করি, এটি সারশূন্য একটি ভ্রান্ত ধারণা ব্যতীত কিছুই নয়...।

প্রিয় ভাই, স্মরণ রাখবেন—হিফজুল কুরআন হচ্ছে এক গুরুদায়িত্ব, এর জন্য চাই চূড়ান্ত পর্যায়ের ত্যাগতিতিক্ষা! পবিত্র এ গ্রন্থের হিফজ এক শ্রেষ্ঠত্বপূর্ণ লক্ষ্য, তা অর্জনে প্রয়োজন দীর্ঘ সময় ও অধ্যবসায়।

ফরিয়াদ মহামহিমের নিকট, এখানে আলোচিত প্রতিটি নিয়ম দ্বারা তিনি আমাদের উপকৃত করুন! নিশ্চয়ই তিনি সবকিছুতে সক্ষম এবং সবার ফরিয়াদে সাড়া দানকারী।

প্রধান নিয়মসমূহ

ইখলাস

এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ইখলাস ও আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা অবলম্বন। কেননা, মানুষ যখন কোনো কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে মূল লক্ষ্য রাখে না, তখন তার সেই কাজ হয় নিষ্ফল ও ব্যর্থ। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

“আপনি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি এই প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যদি আল্লাহর সাথে শরিক স্থির করা হয়, তবে আপনার সমস্ত কর্মকাণ্ড হবে নিষ্ফল এবং আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।” [সুরা যুমার: ৬৫]

অতএব, সাবধান! সংযত হোন কুরআনের বিনিময়ে সম্মান-মর্যাদা কামনা থেকে; বিরত হোন বৈষয়িক উন্নতি বা ইমামতির পদ বাগিয়ে নিতে চাওয়া থেকে; বেঁচে থাকুন কুরআনের কারি হিসেবে প্রসিদ্ধি পাওয়ার ইচ্ছা থেকে; দূরত্ব বজায় রাখুন কুরআনের বিনিময়ে সম্পদ বা দুনিয়াবি কোনো স্বার্থ হাসিল থেকে...।

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণযোগ্য ইলম যদি কেউ

দুনিয়াবি স্বার্থ লাভের জন্য অর্জন করে, তবে কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না।”[১৭]

ইমাম মুসলিম রহ. আবু হুরাইরা রা.-এর সূত্রে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন, যেখানে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে গৌণ রেখে মানুষের সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কাজ করার ভয়াবহতা স্পষ্ট আকারে বিবৃত হয়েছে।

আবু হুরাইরা রা. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বিচার করা হবে একজন শহিদের। তাকে উপস্থিত করা হলে আল্লাহ তার ওপর যে-সমস্ত নিয়ামত দান করেছিলেন, সে কথা উল্লেখ করবেন এবং সে তা স্বীকারও করবে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, এর বিনিময়ে তুমি কী আমল করেছিলে? সে বলবে, শহিদ হওয়া পর্যন্ত আমি আপনার পথে যুদ্ধ করে গেছি...। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ; বরং তুমি যুদ্ধ করেছিলে লোকে যেন তোমাকে বীর-বাহাদুর বলে প্রশংসা করে; আর তা বলাও হয়েছে! এরপর আল্লাহর ফায়সালা অনুযায়ী তাকে উপুড় করে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এমনইভাবে এমন অন্য এক ব্যক্তির বিচার করা হবে, যে ইলম অর্জন ও বিতরণ করেছে এবং কুরআন মাজিদ অধ্যয়ন করেছে। তাকে হাজির করা হলে আল্লাহ তাআলা তার ওপর যে-সমস্ত নিয়ামত দান করেছিলেন, সে-কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং সে তা স্বীকারও করবে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, নিয়ামত পেয়ে বিনিময়ে তুমি কী আমল করেছ? জবাবে সে বলবে, আমি ইলম অর্জন করেছি, অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কুরআন অধ্যয়ন করেছি। জবাবে আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ; তুমি তো ইলম অর্জন করেছিলে লোকে যেন তোমাকে আলেম বলে, কুরআন তিলাওয়াত করেছিলে লোকে যেন তোমাকে কুরআনের কারি বলে; আর তেমনটি হয়েছেও! তারপর আল্লাহর ফায়সালা অনুযায়ী তাকেও উপুড় করে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

---

[১৭]. *সুনানে আবু দাউদ*: ৩৬৫৬।

এমনইভাবে এমন এক ব্যক্তির বিচার হবে, যাকে আল্লাহ তাআলা সচ্ছলতা এবং সর্ববিধ বিত্ত-বৈভব দান করেছিলেন। তাকে উপস্থিত করা হলে আল্লাহ তার ওপর যে-সমস্ত নিয়ামত দান করেছেন, সে কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং সে তা স্বীকারও করবে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, এসব নিয়ামতের বিনিময়ে তুমি কী আমল করেছ? জবাবে সে বলবে, যতসব খাতে সম্পদ ব্যয় করা আপনি পছন্দ করতেন, আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তার সমস্ত খাতেই আমি সম্পদ ব্যয় করেছি। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ; বরং তুমি তা করেছিলে লোকে যেন তোমাকে দানবীর বলে অভিহিত করে; আর তা করাও হয়েছে! অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হলে তাকেও উপুড় করে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"[১৮]

সম্ভাব্য বিষয় ছিল, জাহান্নামের আগুন সর্বপ্রথম প্রজ্বলিত হবে কোনো হত্যাকারী, ব্যভিচারী বা মদপানকারীর জন্যে; কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর সন্তুষ্টির তোয়াক্কা না করে মানুষের সন্তুষ্টি কামনার ভয়াবহতা স্পষ্ট করতে চেয়ে সে দিবসে প্রথম ফায়সালা করার সিদ্ধান্ত নিলেন এমন এক দলের, যারা আমলে ছিল নিষ্ঠাহীন; যারা আমলের সওয়াব বা রবের সন্তুষ্টির ধার ধারেনি—কেবলই দুনিয়ার স্বার্থের পেছনে হন্যে হয়ে ছুটেছে...।

হজরত আবু সাঈদ খুদরি রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা কুরআন শিক্ষা করো এবং তার মাধ্যমে জান্নাত প্রার্থনা করো—সেই জাতি আসার পূর্বে, যারা তা শিক্ষা করবে জাগতিক স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে। মনে রাখবে, তিন শ্রেণির লোক কুরআন শিক্ষা করে থাকে—কিছু লোক তা নিয়ে গর্ব-অহংকার করে, কিছু লোক তার মাধ্যমে স্বার্থ হাসিল করে আর কিছু লোক মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই তার তিলাওয়াত করে।"[১৯]

বান্দার ইখলাস যতটা শক্তিশালী হবে, খোদার কাছে তার পুণ্যের হিসেবও ততটা পুষ্ট হবে। যেমন সহিহ বুখারি ও মুসলিমে ইখলাসের বিষয়টিকে সামগ্রিকভাবে ধারণ করতে পারে, উমর রা. থেকে তেমন একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে—তিনি বলেন, "আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[১৮]. *সহিহ মুসলিম*: ১৯০৫।

[১৯]. *শুয়াবুল ঈমান*: ২৩৮৯।

ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, প্রতিটি আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল; মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ীই প্রতিফল পাবে। অতএব, যার হিজরত হবে জাগতিক উদ্দেশ্যে অথবা কোনো নারীকে বিয়ের জন্যে, তবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে, যে জন্যে সে হিজরত করেছে।"[২০]

কোনো আমলের দ্বারা বান্দার নেক নিয়তের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাবে, আল্লাহর কাছে তার আমলের প্রতিদানও ততটা বড় হবে। উল্লেখ্য, কখনো বান্দা একটি পুণ্য-কাজের মাধ্যমেই একাধিক নেক নিয়ত রাখতে পারে। আর হিফজুল কুরআনের ক্ষেত্রেও সেই সংখ্যা বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ আপনি যে নিয়তগুলো করতে পারেন:

১. অধিক কুরআন তিলাওয়াতের নিয়ত

কেননা একজন হাফেজ তার স্মৃতিশক্তি ব্যবহার করে সর্বস্থানেই কুরআন তিলাওয়াত করতে সক্ষম হয়; সে এমন স্থানেও তা তিলাওয়াত করতে পারে, যেখানে কুরআন শরিফ বের করার পরিবেশ নেই। যেমন ধরুন, সে পথে হাঁটছে বা গাড়ি চালাচ্ছে কিংবা গাড়ির ভেতর প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে সেখানে কুরআন বের করার সুযোগ নেই অথবা সে এমন কোথাও আছে, যেখানে হাতের কাছে কুরআন শরিফ নেই—যেমন ক্লিনিকে, অফিসে, সফরে বা অন্য কোথাও...। অথচ সে স্পষ্ট জানে, কুরআনের একেকটি অক্ষর পাঠে রয়েছে দশটি করে নেকি; রয়েছে এমন প্রতিদান, বান্দার পক্ষে যা অনুমান করাও অসম্ভব!

২. মুখস্থ অংশের মাধ্যমে কিয়ামুল লাইলের[২১] নিয়ত

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, অন্যান্য সুরা না জানার দরুন কিয়ামুল লাইলে নির্দিষ্ট কিছু সুরা বারবার পড়তে পড়তে মানুষের মধ্যে অবসাদ চলে আসতে পারে। কিন্তু একজন হাফেজে কুরআন প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন সুরা তিলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর পুরো কিতাবের স্বাদ নিতে পারে এবং সেই অবসাদটুকু তাকে ছুঁতে পারে না।

---

[২০]. *সহিহ বুখারি*: ১, *সহিহ মুসলিম*: ১৯০৭।

[২১]. এশার পর থেকে ফজরের ওয়াক্ত পর্যন্ত রাত জেগে যে-সমস্ত ইবাদত করা হয়, সামগ্রিকভাবে তাকে 'কিয়ামুল লাইল' বলে। এতে তাহাজ্জুদের নামাজসহ অন্যান্য ইবাদত অন্তর্ভুক্ত। (সম্পাদক)

৩. কুরআনের ধারকবাহক হওয়ার মর্যাদা লাভের নিয়ত

এই নিয়তের ফলে কিয়ামত দিবসে পুরো কুরআনই আপনার জন্য ঢাল হবে। তা ছাড়া এটি সেই মহান লক্ষ্য, যার জন্যে উৎসর্গ করা হয়ে থাকে উম্মাহর দেহ-প্রাণ সবকিছু...।

৪. পিতা-মাতাকে কিয়ামত দিবসে মুকুট পরানোর নিয়ত

মুআজ বিন আনাস রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তদনুযায়ী আমল করে, কিয়ামতের দিন তার পিতা-মাতাকে এমন মুকুট পরানো হবে, সূর্য তোমাদের ঘরে বিরাজমান হলে যে আলো হতো, সেটি তার চেয়েও উজ্জ্বল হবে। তাহলে যে ব্যক্তি কুরআন অনুযায়ী আমল করে, তার [মর্যাদার] ব্যাপারে তোমাদের কী ধারণা!"[২২]

হাদিসটি সনদের বিচারে যদিও দুর্বল, কিন্তু যে-সকল বাবা-মা তার সন্তানদের কুরআনের হাফেজ বানান, তাদের প্রতিদান যে হবে শ্রেষ্ঠতম, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। অতএব, কুরআন হিফজের ক্ষেত্রে সন্তানদের শৈশবকে কাজে লাগানোর জন্য অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে এটি এক সুবিধাজনক বিষয়। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, বাচ্চাদের স্মরণশক্তি প্রাপ্তবয়স্কদের স্মরণশক্তির তুলনায় প্রখর হয়। যেমন প্রবাদ ছিল, বাল্যকালের শিক্ষা পাথরে খোদাই করার মতো (স্থায়িত্ব পায়)।

৫. পরকালীন শাস্তি থেকে বাঁচার নিয়ত

ইমাম দারেমি রহ. আবু উমামা বাহিলি রা. থেকে বর্ণনা করেন, "তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করো আর নির্ভরকৃত এসকল [লিখিত] কুরআন যেন তোমাদের প্রবঞ্চিত করতে না পারে। মনে রেখো, আল্লাহ এমন অন্তরকে শাস্তি দেবেন না, যা কুরআনকে প্রকৃতরূপে ধারণ করে থাকে।"[২৩]

---

[২২]. *সুনানে আবু দাউদ*: ১৪৪৮।
[২৩]. *সুনানে দারেমি*: ৩৩৬২।

৬. অন্যকে শেখানোর নিয়ত

আপনি যখন কুরআন নিজে হিফজ করার পর তা অন্যদের হিফজ করিয়ে, তাজউইদ শিখিয়ে বা তাফসির করে মানুষের কাছে পৌঁছাবেন, তখন প্রমাণিত হয়ে যাবে, আপনি হচ্ছেন এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ একজন। এ কথা আমি বলছি না, বরং বুখারি শরিফে উসমান বিন আফফান রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী এটি! তিনি বলেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে, যে কুরআন শেখে ও শেখায়।"[২৪]

৭. মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্য আদর্শ হবার নিয়ত

আমরা সমাজে একজন দায়িত্বশীল হাফেজ ডাক্তার চাই, আমরা চাই একজন দায়িত্বশীল হাফেজ ইঞ্জিনিয়ার, চাই একজন দায়িত্ববান হাফেজ কৃষক ও হাফেজ কাঠমিস্ত্রি...। আমরা সামাজিক পেশাসমূহে দক্ষতার প্রতি গুরুত্বদানের পাশাপাশি হিফজ ও দায়িত্বশীলতার গুণ সম্পৃক্ত করে দিতে পারলে একটি দাওয়াতি বিপ্লব ঘটানো সম্ভব হবে। এভাবে মানুষরা তাদের পেশাগত দক্ষতা এবং ইসলাম, দায়িত্বশীলতা ও কুরআন হিফজের মাঝে সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হবে। বস্তুত এটি হবে এক আদর্শিক দাওয়াতি বিপ্লব, অন্য কোনো আহ্বান যার সমতুল্য হতে সক্ষম হবে না।

এই হলো কুরআন হিফজের ক্ষেত্রে কিছু উত্তম নিয়তের উদাহরণ। তবে এ ক্ষেত্রে সকল মুসলমানেরই অন্য আরও অনেক নেক নিয়ত লালনের অবকাশ রয়েছে নিঃসন্দেহে...।

---

[২৪]. *সহিহ বুখারি*: ৫০২৭।

দুই

দৃঢ় সংকল্প

হিফজুল কুরআন অত্যন্ত গুরুত্বভার একটি কাজ, কেবল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিরাই যার সক্ষমতা রাখে। এই প্রকারের লোকেরা মূলত দৃঢ় সংকল্প নামক বিরাট এক গুণের অধিকারী হয়ে থাকেন। এসকল ব্যক্তিদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলা হয়, কেননা তারা উদ্দিষ্ট কর্মসাধনে পরম আগ্রহ পোষণপূর্বক চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রচেষ্টা চালায়। প্রতিটি মুসলিমের অন্তরেই যদিও হিফজুল কুরআনের আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান থাকে, কিন্তু কেবল এই ঝোঁকই যথেষ্ট নয়; বরং এর সাথে থাকতে হবে কর্মসাধনের দুর্দান্ত স্পৃহা। আল্লাহ তাআলার এই বাণীর প্রতি ভালো করে লক্ষ করুন,

﴿وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا﴾

“যে ব্যক্তি পরকাল কামনা করে এবং ঈমানের সঙ্গে সে-জন্য যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টার পরিপূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হবে।” [সূরা বনি ইসরাইল: ১৯]

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, ব্যক্তিমাত্রই পরকালের সফলতা কামনা করে, কিন্তু তাদের মধ্যে সত্যবাদী-মিথ্যাবাদী চিহ্নিত হওয়ার উপায় কী?! সেই উপায় হচ্ছে, প্রথমত ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষেই অন্তরে কর্মের ইচ্ছা পোষণ করবে, এরপর তার এই আগ্রহকে দৃঢ় সংকল্পে রূপ দেবে, তারপর সেই সংকল্পকে একসময় বাস্তবকার্যে পরিণত করবে। বস্তুত এই অবস্থাই আল্লাহ তাআলার বাণী ‘যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করা’-এর প্রকৃত ব্যাখ্যা। মুমিন ব্যক্তি ধারাবাহিকভাবে এ কাজ করতে থাকলে একসময় সেটি তার অভ্যাসে পরিণত হবে। এরপর আর তার জীবনে কোনো দিন এমন কাটবে না, যেদিন

সে কুরআন তিলাওয়াত, নতুন হিফজ বা পেছনের মুখস্থ অংশকে ঝালিয়ে নিতে প্রচেষ্টায় লিপ্ত হবে না। সত্য বলতে, এই দৃঢ় সংকল্পই ব্যক্তিকে হিফজুল কুরআনের সৌভাগ্যপ্রাপ্তি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়...।

শাদ্দাদ বিন আওস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “বুদ্ধিমান সে ব্যক্তি, যে নিজের নফসের হিসাবনিকাশ রাখে এবং মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে। আর নির্বোধ সেই ব্যক্তি, যে তার নফসের চাহিদা পূরণ করতে থাকে, আবার আল্লাহ তাআলার নিকট [বৃথা] আশা পোষণ করে।”[২৫]

অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে কুরআন হিফজ করতে পারার আশা রাখে, কিন্তু সে ব্যাপারে কোনোরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে না—সে হচ্ছে মূলত নির্বোধ, অলীক বিশ্বাসে আক্রান্ত; দ্বীন ইসলামের স্বভাব-প্রকৃতি অনুধাবনের ব্যাপারে সে ব্যর্থ।

এজন্য বলছি, প্রিয় ভাই, অধ্যয়নরত এই পুস্তিকা শেষ করার সাথে সাথে আজই আপনি কুরআন হিফজের কাজে আত্মনিয়োগ করুন! আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে রাখবেন না যেন...। আর ‘অচিরেই করব’ বাক্য থেকে বেঁচে থাকুন; আজ নয়, বরং কাল করব—এমন গড়িমসি আপনাকে যেন ধোঁকায় না ফেলে! অনেকের অনেক নেক আমলের সুযোগ নষ্ট হয়ে যায় শুধু এ কারণে যে—তারা ভেবেছিল কাল বা পরশু শুরু করব অথবা ওই কাজটা শেষ হলে এই কাজটায় মনোযোগ দেবো...। অতএব, দৃঢ় প্রতিজ্ঞাপূর্বক আপনি আপনার সন্তানদের নিয়ে আজই এই মহান কর্মে আত্মনিয়োগ করুন!

---

[২৫]. *সুনানে ইবনে মাজাহ:* ৪২৬০, *জামে তিরমিযি:* ২৪৫৯, *মুসনাদে আহমাদ:* ১৭১২৩।

কুরআন হিফজের মূল্য অনুধাবন

যে ব্যক্তি কোনো বিষয় বা বস্তুর মূল্য অনুধাবন করতে পারে, সে তার জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ের চেষ্টা-মেহনত ও ত্যাগতিতিক্ষা করতে সক্ষম হয়। এই চিত্র জাগতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; মানুষ যখন কোনো কাজের মূল্য এবং তার মাধ্যমে আগত লাভের ব্যাপারে অবগত থাকে, স্বাভাবিকভাবেই সে তার পেছনে অধ্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে থাকে।

পরকালীন ব্যাপারটিও তা থেকে ভিন্ন কিছু নয়। আপনি যখন কোনো আমলের প্রতিদানের মূল্য অনুধাবন করতে পারবেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতি আপনার আগ্রহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবে। উদাহরণত, কোনো এক ব্যক্তি কিয়ামুল লাইল বা জামাতে নামাজ পড়ার বিস্তারিত ফজিলত, পক্ষান্তরে অন্য একজন শুধু এটুকু জানে যে এগুলো বেশ ভালো কাজ, অতএব তারা দুজন যেমন সমান নয়, ঠিক তেমনইভাবে, যে ব্যক্তি বিস্তারিতভাবে কুরআনের ফজিলত জানে, সেও এই গ্রন্থের একটু-আধটু ফজিলত জানা ব্যক্তির অনুরূপ নয়...।

প্রিয় ভাই, নিম্নে আমরা কুরআন সম্পৃক্ত কিছু ফজিলতের কথা উল্লেখ করছি। তবে আমাদের অনুল্লেখিত বাণীও রয়ে গেছে প্রচুর পরিমাণে...।

১. হযরত আনাস বিন মালেক রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কুরআনের অধিকারীরা হচ্ছে আল্লাহর পরিজন এবং তাঁর বিশেষ বান্দা।"[২৬]

২. ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "দুটি বিষয় ছাড়া অন্য

[২৬]. *সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ি*: ৭৯৭৭।

কোনো বিষয়ে ঈর্ষা[২৭] করা যায় না। প্রথমত, যাকে আল্লাহ তাআলা কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন আর সে দিন-রাত তা তিলাওয়াত করতে থাকে। দ্বিতীয়ত, যাকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ দান করেছেন আর সে দিন-রাত তা থেকে দান করতে থাকে।"[২৮]

৩. ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যার হৃদয়ে কুরআনের কিছুই নেই, সে বিধ্বস্ত ঘরের মতো।"[২৯]

৪. আবদুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "[কিয়ামতের দিন] কুরআনের অধিকারী ব্যক্তিকে বলা হবে, তিলাওয়াত করতে থাকো আর উচ্চে আরোহণ করতে থাকো; দুনিয়াতে যেভাবে তারতিলের সাথে পাঠ করতে, ঠিক সেভাবেই তারতিলের সাথে পাঠ করে যাও। যে আয়াতে তোমার পাঠ সমাপ্ত হবে, সেখানেই হবে তোমার স্থান।"[৩০]

অতএব, আলোচিত হাদিসগুলোর মাধ্যমে কুরআন হিফজের মূল্য সম্পর্কে ধারণা লাভের পর এবার আপনার অবশ্যকর্তব্য হলো, এই কাজের জন্য সময়, চেষ্টা-সাধনা এবং চিন্তাভাবনা ব্যয়ে আত্মনিয়োগ করা। বস্তুত আল্লাহই একমাত্র তওফিকদাতা!

---

[২৭]. এই হাদিসে মূলত রূপকার্থে ঈর্ষা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, এই দুই ক্ষেত্রেও ঈর্ষার মূল অর্থ অনুযায়ী অন্যের নিয়ামত দূরীভূত হওয়ার কামনা করা বৈধ নয়; শুধু এটুকু কামনা করার অবকাশ রয়েছে, আল্লাহ তার নিয়ামতও বহাল রাখুন, পাশাপাশি আমাকেও তার মতো নিয়ামতে সিক্ত করুন। একে আরবিতে 'গিবতা' শব্দে ব্যক্ত করা হয়। (সম্পাদক)

[২৮]. *সহিহ বুখারি*: ৫০২৫, *সহিহ মুসলিম*: ৮১৫।

[২৯]. *জামে তিরমিযি*: ২৯১৩।

[৩০]. *জামে তিরমিযি*: ২৯১৪।

হিফজকৃত বিষয়াবলির ওপর আমল করা

স্বাভাবিকভাবেই তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ধ্বংস সে ব্যক্তির জন্য, যে ইলম শিখল, কিন্তু তদনুযায়ী আমল করল না!

হযরত আনাস বিন মালিক রা. বলেন, “কিছু কুরআন তিলাওয়াতকারীকে খোদ কুরআন অভিসম্পাত করতে থাকে।”[৩১]

কিন্তু কুরআন কেন তার তিলাওয়াতকারীকে অভিশাপ দেয়?! কারণ, সে কুরআন পড়ে, মুখস্থ করে; কিন্তু পরবর্তী সময়ে সে অনুযায়ী আমল করে না।

সে সুদের আয়াতগুলো পড়ে ও মুখস্থ করে এবং সে জানে যে সুদের লেনদেনকারী ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে—কিন্তু তারপরও সে সুদের কারবার করে! সে পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের আয়াত পাঠ করে ও মুখস্থ করে, তাদের মর্যাদা ও তাদের কষ্ট দেওয়ার শাস্তির ব্যাপারে জানে—তারপরও সে পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়! বস্তুত এগুলোই তাকে অভিশাপের উপযুক্ত বানায়...। আমরা আল্লাহর নিকট এসব থেকে আশ্রয় কামনা করছি।

কুরআনের সাথে আমাদের আচরণ কেমন হবে, সাইয়িদুনা উমর রা. সে ব্যাপারে দারুণ পথ বাতলে দিয়েছেন। তার জীবন থেকে জানা যায়, তিনি যখনই নতুন কিছু মুখস্থ করতেন, সে অনুযায়ী আমল করতেন; এরপর অন্য কিছু মুখস্থের উদ্যোগ নিতেন। কেননা, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, কুরআন এমন কোনো গ্রন্থ নয়, যা কেবল মুখস্থ করা বা বরকত লাভের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে; বরং কুরআন মুসলমানদের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, সামাজিক

[৩১]. *ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন*: ৩২৪।

জীবনের ছোট-বড় সকলকিছু পরিচালনার ক্ষেত্রেই এই গ্রন্থে দিকনির্দেশনা ও বিধিবিধান বিদ্যমান রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَاتَّبِعُوٓا اَحۡسَنَ مَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡكُمۡ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ يَّاۡتِيَكُمُ الۡعَذَابُ بَغۡتَةً وَّاَنۡتُمۡ لَا تَشۡعُرُوۡنَ﴾

“আপন রবের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হওয়া উত্তম বিষয়ের অনুসরণ করো তোমাদের উপর অতর্কিতে ও অজ্ঞাতসারে আজাব চলে আসার পূর্বেই।” [সুরা যুমার: ৫৫]

তিনি আরও বলেন:

﴿وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنۡزَلۡنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوۡهُ وَاتَّقُوۡا لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُوۡنَ﴾

“এটি আমার অবতীর্ণ করা বরকতময় এক গ্রন্থ। অতএব, এর অনুসরণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলো—যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও।” [সুরা আনআম: ১৫৫]

এ জন্যই, যে ব্যক্তি এই কিতাব হিফজ করল, কিন্তু তাকে আমলে পরিণত করল না, প্রকৃতপক্ষে সে এই কিতাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং গুরুত্বই উপলব্ধি করতে পারল না।

সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা রহ. বলেন, “সবচেয়ে নির্বোধ সে, যে নিজের জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে না; সবচেয়ে জ্ঞানী সে, যে জ্ঞানানুসারে আমল করে। আর লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম সে, যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে।”[৩২]

বস্তুত এই বোধ ও মর্মোপলব্ধির ওপরই ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সাহাবা (রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন)।

আলি বিন আবু তালেব রা. বলেন, “হে ইলমের ধারকবাহকগণ, ইলম অনুযায়ী আমল করো! কেননা, আলেম হলো সেই ব্যক্তি, যে তার ইলম অনুসারে আমল করে এবং তার ইলম তার আমলকে স্বীকৃতি দেয়। অচিরেই

---

[৩২]. *সুনানে দারেমি*: ৩৪২।

ইলমের ধারক এমন একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে, ইলম যাদের কণ্ঠনালিও অতিক্রম করবে না। তাদের আমলকে তাদের ইলম স্বীকৃতি দেবে না, তাদের গোপন আচরণ বাহ্যিক আচরণের বিপরীত হবে, তারা কোনো মজলিসে বসলে গর্ব-অহংকারে লিপ্ত হবে—এমনকি তাদের কোনো সঙ্গী যদি তাদের ছেড়ে অন্য কারও সাথে উঠবস করে, তবে তার প্রতি তারা ক্রোধান্বিত হয়ে উঠবে...। এরা সেই দল, যাদের সে-সব মজলিসের আমল আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।"[৩৩]

ইয়ামামার যুদ্ধে হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা.-ও এই রীতি অবলম্বন করেছিলেন। তিনি যখন হাফেজ মুসলিম মুজাহিদদের সাহস দিতে চাইতেন, তখন দাঁড়িয়ে বলতেন, "হে কুরআনের অধিকারীগণ, কুরআনকে হাতল [আমল] দ্বারা সজ্জিত করো।"[৩৪]

বুঝা গেল, কুরআন হিফজ করাই মূল লক্ষ্য নয়; বরং হিফজের সাথে অবশ্যই আমলের অনুসারী হতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, হিফজকৃত অংশের ওপর আমল করা হলে তা নতুন অংশের হিফজ করা সহজ করে তুলবে। যেমন প্রবাদ রয়েছে, যে ব্যক্তি জ্ঞাত ইলম অনুযায়ী আমল করে, আল্লাহ তাকে অজানা বিষয়ের জ্ঞান প্রদান করেন।

অতএব, হিফজকৃত অংশের ওপর আমল মূলত কুরআনের নতুন অংশ হিফজ করার পথে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

---

৩৩. *সুনানে দারেমি*: ৩৯৪।

৩৪. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*: ৬/৩৬৭; [দারুল ইহয়ায়িত তুরাছিল আরাবি, প্রথম সংস্করণ- সূত্র: মাকতাবায়ে শামেলা]

গোনাহ পরিত্যাগ করা

যে হৃদয় গোনাহর নেশায় আসক্ত, সে হৃদয়ও কি কুরআন ধারণ করতে পারে!! বস্তুত, বান্দা যত গোনাহে লিপ্ত হয়, তার হৃদয় তত কলুষিত হয়, আর তা যত বেশি কলুষিত হয়, এই পবিত্র কিতাব ধারণের ওপর তত বেশি শক্তি হারাতে থাকে...।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "বান্দা যখন একটি গোনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। এরপর যখন সে গোনাহর কাজ পরিহার করে তওবার সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তার অন্তর তখন পরিষ্কার ও দাগমুক্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সে আবার পাপ করলে তার অন্তরে দাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে আর এভাবে তার পুরো অন্তর কালো দাগে ঢেকে যায়। এটাই সেই মরিচা, যা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে,

> *'কখনো নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের মনে জং (মরিচা) ধরিয়েছে।'"*[৩৫] [সুরা মুতাফফিফিন: ১৪]

এ ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে, কেবল স্পষ্ট গোনাহই নয়, বরং আল্লাহ তাআলা আমাদের সন্দেহ-সংশয়জনক গোনাহ থেকেও বেঁচে থাকতে আদেশ করেছেন। যেমন নুমান বিন বশির রা. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "হালালও স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ-দুয়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয়, যার জ্ঞান অনেক মানুষেরই নেই। যে ব্যক্তি সে-সব সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে, সে তার দ্বীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে সন্দেহজনক বিষয়সমূহে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তার উদাহরণ

---

[৩৫]. *জামে তিরমিযি*: ৩৩৩৪।

সেই রাখালের ন্যায়, যে তার গবাদি পশু বাদশাহর সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে চরায়—বিধায় পশুগুলো সেখানে ঢুকে পড়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে। জেনে রেখো, প্রত্যেক বাদশাহরই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে; আর আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হচ্ছে তাঁর নিষিদ্ধ কাজসমূহ। আরও জেনে রেখো, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরা আছে, তা যখন সুস্থ-সুষ্ঠু হয়ে যায়, পুরো শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর সেটা যখন নষ্ট হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন অসুস্থ-অসুষ্ঠু হয়ে পড়ে—আর সে গোশতের টুকরোটি হলো 'কলব' (অন্তর)।"[৩৬]

এই বোধ ইমাম শাফিয়ি রহ. পেয়েছিলেন তাঁর শায়খ ইমাম ওয়াকি রহ.-এর প্রায়োগিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে। ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর আশ্চর্যজনক ধী-শক্তির খ্যাতি ছিল, কোনোকিছু কেবল একবার দেখেই তিনি মুখস্থ করে ফেলতে পারতেন। কিন্তু একদিন তিনি লক্ষ করলেন, তার মেধা স্বভাবসুলভ কাজ করছে না। তখন তিনি তার শায়খ ওয়াকি রহ.-এর নিকট গিয়ে স্মরণশক্তির বিভ্রাটের কথা জানালেন। উত্তরে তিনি বললেন, আমার মনে হয় এটা তোমার কোনো গোনাহর কারণে হচ্ছে। তখন শাফিয়ি রহ.-এর ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল, একবার বাতাসের কারণে এক মহিলার পায়ের গোড়ালির কাপড় উঠে যায় আর সেখানে তাঁর নজর পড়ে। তখন তিনি বুঝতে পারলেন, এ-ই সেই গোনাহ, যা তার স্মরণশক্তিতে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। তখন তিনি জ্ঞান-প্রজ্ঞায় ভরপুর অপূর্ব সেই পঙক্তি-চতুষ্টয় রচনা করেন। তিনি বলেন,

شَكَوتُ إِلى وَكيعٍ سوءَ حِفظي   فَأَرشَدَني إِلى تَركِ المَعاصي

وَقالَ: إِنَّ العِلمَ نورٌ   وَنورُ اللهِ لا يُهدى لِعاصي

"স্মরণবিভ্রাটের অভিযোগে এলাম ওয়াকির নিকট,
গোনাহ ত্যাগের নসিহতে করলেন পথনির্দেশ...।
শুধালেন, ইলম যে এক আলোক,
রবের সেই আলোক অর্জিত হয় না কোনো পাপিষ্ঠের।

---

৩৬. *সহিহ বুখারি:* ৫২, *সহিহ মুসলিম:* ১৫৯৯।

সুবহানাল্লাহ! এই গোনাহই যখন ইমাম শাফিয়ির স্মরণশক্তিতে গোলযোগ তৈরি করেছিল, তাহলে এবার আমরা আশা করি বুঝতে পারব, কেন মাঝেমধ্যে কুরআন হিফজ আমাদের জন্য এতটা কঠিন হয়ে পড়ে!!

আবু উবাইদ রহ. শ্রেষ্ঠতম তাবিয়ি দাহহাক বিন মুযাহিম রহ.-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ আশ্চর্যজনক এক বাণী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি কুরআন শিখে ভুলে যায়, সেটা কেবল তার গোনাহর কারণেই হয়ে থাকে...। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِيكُمۡ﴾

'তোমাদের উপর যে-সব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল।' [সুরা শুরা: ৩০]

আর আল্লাহর কুরআন ভুলে যাওয়া তো বড়সড় বিপদগুলোর অন্তর্ভুক্ত![৩৭]

---

৩৭. *শুয়াবুল ঈমান*: ১৮১৩।

দোয়া

যে মাধ্যমটি কখনো নিরাশার সম্মুখীন হয় না, তা হলো নিষ্ঠা ও সততার সাথে মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে দোয়া করা। আর আমিও আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করি, তিনি আপনাকে কুরআনুল কারিম হিফজ করার নিয়ামত দান করুন, আপনার নিয়ত তার সন্তুষ্টির জন্য একনিষ্ঠ করে দিন এবং কুরআন অনুযায়ী আমল করা আপনার জন্য সহজ করুন।

প্রিয় ভাই, দোয়ার জন্য আপনি নিজে কিছু সময় নির্বাচন করে নিন। বিশেষ করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সময়গুলোতে দোয়া করার নির্দেশনা দিয়েছেন...। যেমন: রাতের শেষ প্রহরে, নামাজের শেষে, রমজানের শেষ দশকে—বিশেষ করে বেজোড় রাতগুলোতে, বৃষ্টি চলাকালীন বা সফরে থাকা অবস্থায় ইত্যাদি।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি, হিফজুল কুরআনের জন্য বিশেষ কোনো দোয়া বা নির্দিষ্ট কোনো নামাজ নেই। নির্দিষ্ট দোয়া বা নামাজের যে-সব কথা প্রচলিত রয়েছে, সেগুলো সব ভিত্তিহীন। আপনার মনে যে দোয়া আসে, তা দিয়েই আল্লাহকে ডাকুন—যে ভাষা বা শব্দ আসে, তা-ই বলতে থাকুন। আল্লাহর নিকট দোয়া করি, তিনি আপনার ডাকে সাড়া দিন।

মর্ম বুঝে হিফজ করা

যে ব্যক্তি হিফজকৃত আয়াতসমূহের মর্ম বুঝতে পারবে, নিঃসন্দেহে তার জন্য হিফজ করা অত্যন্ত সহজ হবে। বিশেষত সে-সব সুরা, যেগুলোতে নানান ঘটনা বর্ণিত হয়েছে অথবা যে-সব আয়াতের প্রসিদ্ধ শানে নুজুল (পটভূমি) রয়েছে। তেমনইভাবে যে-সব আয়াত ফিকহি বিধান সংবলিত, যেমন: অজু, কসম বা জিহারের কাফফারা, রোজা, ভুলক্রমে হত্যার রক্তপণ ইত্যাদি, যেগুলোর হিফজও সহজ হবে বলে আশা করি।

যে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ কুরআন হিফজ করতে চায়, তার জন্য উচিত হচ্ছে সহজ কোনো তাফসিরগ্রন্থের সহায়তা নেওয়া। তাহলে অল্প সময়ে ও সংক্ষেপে অর্থের মর্ম বুঝতে সুবিধা হবে। উদাহরণস্বরূপ যে গ্রন্থগুলো সহায়ক হতে পারে:

১. মুখতাসারু ইবনে কাসির

২. মুখতাসারুত তাবারি

৩. তাফসিরুস সাদি (تفسير السعدي)

৪. তাফসিরু মুহাম্মদ ফরিদ ওয়াজদি

৫. তাফসিরুল জালালাইন, ইত্যাদি।

তবে কোনো আয়াত বা সুরার বিস্তারিত তাফসির জানতে চাইলে প্রসিদ্ধ পূর্ণাঙ্গ তফসিরগ্রন্থগুলোর শরণাপন্ন হতে হবে। যেমন:

১. তাফসিরে ইবনে কাসির

২. তাফসিরে কুরতুবি

৩. ফি যিলালিল কুরআন

৪. আল-আসাস ফিত-তাফসির, ইত্যাদি।[৩৮]

আমি আবারও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এই মহান গ্রন্থই আমাদের জীবনের একমাত্র সংবিধান। অতএব, যে ব্যক্তি তা অনুযায়ী আমল করতে চায়, তার জন্য আয়াতসমূহের সঠিক ও শাশ্বত ব্যাখ্যা জানা আবশ্যক। বস্তুত, মর্মসহ একটি আয়াত হিফজ করাও মর্ম না বুঝে দশটি আয়াত হিফজের চেয়ে উত্তম।

সঠিক তাজউইদ (তিলাওয়াতজ্ঞান) জানা

কুরআন পাঠের জন্য তাজউইদজ্ঞান বড়ই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বস্তুত, কেউ আরবি ভাষাভাষী হলেই সে শুদ্ধরূপে কুরআন পড়তে পারে না। কারণ, কুরআন পাঠের বিশেষ কিছু নীতিমালা আছে, যেগুলো কেবল আল্লাহর কিতাবের জন্যই প্রণীত। আল্লাহ তাআলা চান, আমরা তার কালাম ঠিক সেভাবে পাঠ করি, যে নিয়মে তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরিল আলাইহিস সালাম থেকে শিখে সাহাবায়ে কেরামকে শিক্ষা দিয়েছেন। আর সেই তাজউইদের সাথেই এই মহৎ জ্ঞান প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরের ধারাবাহিকতায় আমাদের পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে।

ইনশাআল্লাহ—কিয়ামত পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকবে...।

তাজউইদসহ কুরআন পড়লে হিফজ করাটাও সহজ হয়। এই বিশেষ ধ্বনিজ্ঞান কুরআনকে একেবারে হৃদয়ে গেঁথে দেয়। অতএব, হিফজে আগ্রহী প্রতিটি মুসলিমের অবশ্যকর্তব্য হলো দ্রুত তাজউইদ শিখে নেওয়া। কেননা, হিফজ সমাপ্ত করার পর সেগুলোর তাজউইদ ঠিক করা অনেকটা দুঃসাধ্য

[৩৮]. উল্লিখিত গ্রন্থগুলোর সব বাংলা ভাষায় অনূদিত নেই, তাই কুরআনের অর্থ ও সংক্ষিপ্ত-বিস্তারিত তাফসিরের জন্য এই গ্রন্থগুলো দেখা যেতে পারে, যথা: 'তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন' 'তাফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন' 'তাফসীরে ইবনে কাছীর' ইত্যাদি। (সম্পাদক)

ব্যাপার। ফলে যদি কেউ ভুল তাজউইদে কুরআন হিফজ করে ফেলে, দুর্ভাগ্যবশত সারাজীবন সেভাবেই তাকে কুরআন পড়ে যেতে হবে।

সঠিক তাজউইদসহ কুরআন হিফজ করার দরুন আল্লাহ তাআলার নিকট উত্তম প্রতিদানের আশা করা যায়। সুতরাং, তাজউইদের রীতিশৈলী যত কঠিনই হোক না-কেন, প্রতিটি কুরআন শিক্ষার্থীরই এর জন্য চেষ্টা-সাধনা করা উচিত। কেননা, কুরআন শেখার এ যাত্রার প্রতিটি কসরতই তার প্রতিদানের পাল্লা ভারী করবে। যেমন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কুরআন পড়তে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত রাসুলগণের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি [হিফজ দুর্বলতার দরুন] তার জন্য কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও আটকে আটকে কুরআন পাঠ করে, তার জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে।"[৩৯] উল্লেখ্য, *সহিহ বুখারির* বর্ণনায় প্রথমাংশে রয়েছে, "হাফেজ কুরআন তিলাওয়াতকারী ব্যক্তি..."।

ইমাম নববি রহ. 'সম্মানিত রাসুলগণ'-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর দ্বারা এখানে মানুষ নবী-রাসুলদেরও উদ্দেশ্য নেওয়া যায়, আবার ফেরেশতা ওহিবাহকদেরও উদ্দেশ্য নেওয়া যায়—তবে যারাই হোক, প্রকৃতপক্ষে উভয় দলই পরম সম্মানিত ও মর্যাদাবান।

একটি বিষয়ে সতর্ক করার প্রয়োজন বোধ করছি, কুরআনের তাজউইদ সরাসরি অভিজ্ঞ কোনো হাফেজ শিক্ষকের নিকট শেখা চাই। কেননা, কোনো বই বা অডিও ক্লিপের উপর নির্ভর করে শুদ্ধ তাজউইদ শেখা অসম্ভব ব্যাপার! তবে প্রথমে শিক্ষকের কাছ থেকে শুনে পরবর্তী সময়ে অডিও ক্লিপ, কম্পিউটার সফটওয়্যার, কুরআনের তিলাওয়াত শোনা বা কোনো তাজউইদের বই ইত্যাদির সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

অভিভাবকদের উচিত, শৈশবেই বাচ্চাকে কুরআন হিফজ করানোর জন্য শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। আপন সন্তানকে কুরআন হিফজ করানোর বিশাল উপকারের ব্যাপারটি মাথায় রেখে মুসলিম বাবা-মায়েদের জন্য বাচ্চাদের স্মরণশক্তি তেজোদীপ্ত ও প্রখর থাকার এই সময়টিকে যথাযথ মূল্যায়ন করা উচিত...।

---

[৩৯]. *সহিহ মুসলিম*: ৭৯৮, *সহিহ বুখারি*: ৪৯৩৭।

নয়

ধারাবাহিক তিলাওয়াত

প্রত্যেক মাসে অন্তত একবার কুরআনুল কারিম খতমের (পাঠ করে শেষ করা) চেষ্টা করা উচিত। যদি এরচেয়েও কম সময়ে পারা যায়, তাহলে তো আরও ভালো। সাহাবায়ে কেরামের একটি বড় অংশই সপ্তাহে একবার কুরআনুল কারিম খতম করতেন; আবার কেউ কেউ তো মাত্র তিনদিনেও খতম করতেন!

বুদ্ধিমান প্রতিটি ব্যক্তিই অবগত আছেন, অধিক কুরআন তিলাওয়াতকারী ব্যক্তি অধিক সওয়াবের অধিকারী হয়ে থাকে, পাশাপাশি এটি হিফজকেও আরও শক্তিশালী করে। তা ছাড়া যে-সমস্ত সুরা ও আয়াত এখনো মুখস্থ করা হয়নি, বারবার পড়ার কারণে সেগুলোও স্মৃতিশক্তির কাছাকাছি এসে যাবে, ফলে পরবর্তী সময়ে সেই জায়গাগুলোর হিফজ করা অত্যন্ত সহজ হবে।

অধিক তিলাওয়াতের দ্বারা মুখস্থ সুরাগুলো 'স্বল্পমেয়াদি স্মৃতি' থেকে 'দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতি'-তে চলে আসে। 'স্বল্পমেয়াদি স্মৃতি'-এর বৈশিষ্ট্য হলো, কোনো বিষয় তাতে দ্রুত মুখস্থ হয়, কিন্তু তার মেয়াদকাল হয় সংক্ষিপ্ত...। আর 'দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতি' লম্বা সময় ব্যয় করে তথ্যসমূহ ধারণ করলেও সেগুলো দীর্ঘ সময় ধরে হেফাজত করতে পারে। আর মুখস্থ করার বিষয়াদিকে 'দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতি'-তে প্রবেশ করানোর সর্বস্বীকৃত পদ্ধতি হলো, সেগুলোর 'তাকরার' বা বারংবার পাঠ। অতএব, অধিক তিলাওয়াত হিফজকে সুদৃঢ় করবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "এটি খুবই খারাপ কথা যে—তোমাদের কেউ বলবে, আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি; বরং তাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে! সুতরাং, তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকো;

কেননা, তা মানুষের অন্তর থেকে পলায়নপর উটের চেয়েও অধিক বিস্মৃতিময়।"[৪০]

ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কুরআনের অধিকারী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হচ্ছে উট বেঁধে রাখা ব্যক্তির মতো—যদি সে উটটি বেঁধে রাখে, তবে সেটি তার নিয়ন্ত্রণে থাকবে, আর যদি সে তার বাঁধন খুলে দেয়, তবে তা পালিয়ে যাবে।"[৪১]

ইবনু উমর রা. থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরও বাণী বর্ণিত রয়েছে, "কুরআনের অধিকারী ব্যক্তি যদি দিন-রাত কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করে, তাহলে তা স্মরণ রাখতে পারবে, অন্যথায় তা ভুলে যাবে।"[৪২]

তিলাওয়াত শ্রবণও অনেকটা তিলাওয়াত করার মতোই। কারণ, কুরআনের বারংবার শ্রবণ আয়াতগুলোকে 'দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতি'-তে প্রবেশ করাতে সাহায্য করে। অতএব প্রিয় ভাই, গাড়ি, বাস, বা ট্যাক্সিতে সাথে থাকা অডিও ডিভাইসের মাধ্যমে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে থাকুন। তা ছাড়া এটি একধরনের দাওয়াত বলেও গণ্য হবে, বিধায় যতগুলো কানে এই আয়াত পৌঁছবে, সেই সওয়াবও আপনি প্রাপ্ত হবেন...।[৪৩]

অতএব, সম্ভব হলে আপনার সাথে হিফজকৃত অংশের অডিও রাখুন, এতে অধিক কুরআন শ্রবণকরত আপনার হিফজকে আপনি শক্তিশালী করে তুলতে পারবেন। পাশাপাশি, রেডিওতে প্রচারিত কুরআন শোনার প্রতিও আমি জোর সমর্থন জানিয়ে বলছি, আপনার চ্যানেলটি আপনি কুরআন তিলাওয়াতের কোনো চ্যানেলেই রাখুন, নিশ্চয় এতে অনেক বরকত ও কল্যাণ রয়েছে...।[৪৪]

---

[৪০]. *সহিহ বুখারি*: ৫০৩২, *সহিহ মুসলিম*: ৭৯০।

[৪১]. *সহিহ বুখারি*: ৫০৩১, *সহিহ মুসলিম*: ৭৮৯।

[৪২]. *সহিহ মুসলিম*: ৭৮৯।

[৪৩]. তবে এ ক্ষেত্রে পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। যে-স্থলে তা বিরক্তির কারণ হতে পারে, সেখানে উচ্চ আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াত উচিত নয়। (সম্পাদক)

[৪৪]. উল্লেখ্য, লেখকের দেশ মিশরে সার্বক্ষণিক কুরআন তিলাওয়াত শোনার জন্য ১৯৬৪খ্রি. থেকেই বিজ্ঞাপনহীন আলাদা রেডিও চ্যানেল রয়েছে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, কোটি কোটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের এ দেশে এখন অবধি আমাদের সে রকম কোনো রেডিও চ্যানেল নেই। তবে উন্নত প্রযুক্তির বদৌলতে এখন আমরা সহজেই অনলাইনের মাধ্যমে বিশ্বের=

হিফজ মজবুতকরণে শ্রবণের গুরুত্ব বুঝতে নিম্নোক্ত হাদিসটির প্রতি লক্ষ করুন, এতে এর ভূমিকার প্রতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে—কেননা এটি স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়েছে! যেমন হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে রাতে কুরআন পড়তে শুনে বললেন, আল্লাহ তার প্রতি রহমত করুন। কারণ, সে আমাকে অমুক অমুক আয়াত মনে করিয়ে দিয়েছে, যাতে আমার বিস্মৃতি এসে গিয়েছিল।"[৪৫]

হিফজকৃত অংশ দ্বারা খুশুখুজুর সাথে নামাজ আদায় করা

নামাজে কুরআন তিলাওয়াতও আপনার হিফজকে খুব শক্তিশালী করতে পারে। যেমন: প্রথমে সদ্য মুখস্থকৃত অংশটুকু পড়ুন, এরপর পূর্বে হিফজ করা অংশের তিলাওয়াত করুন। কেউ বলতে পারেন, আমি তো মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করি, তাই নিজে তিলাওয়াত করতে পারি না; বরং ইমামের তিলাওয়াত শুনি কেবল—অতএব, আমার জন্য এই আমল করা কঠিন। এ ক্ষেত্রে আমি বলব, আল্লাহ আপনাকে বরকত দান করুন...। আপনি যা করছেন, সকল মুসলিম থেকে আমরাও সেটাই কামনা করি—অর্থাৎ সবাই মসজিদে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করুক। কেননা, এটা মোটেও যুক্তিসংগত কথা নয় যে—কেউ কুরআন হিফজ করতে গিয়ে তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মসজিদের জামাতে নামাজ পড়া ছেড়ে দেবে!

=যেকোনো দেশের কুরআন তিলাওয়াত সম্প্রচারমূলক রেডিও চ্যানেলগুলো সরাসরি শুনতে পারি। (সম্পাদক)

[৪৫]. *সহিহ বুখারি*: ৫০৩৮।

তবে এক্ষেত্রে একটি উত্তম সমাধান রয়েছে—এমন এক প্রকার নামাজ রয়েছে, আপনি যদি তা নিয়মতান্ত্রিকভাবে আদায় করেন, তবে তা আপনার হিফজ শক্তিশালী করার ক্ষেত্রেও খুব সহায়ক হবে, পাশাপাশি তার জন্য আপনার বিরাট আকারের সওয়াবও অর্জিত হবে—আর সেই সুযোগ হলো কিয়ামুল লাইল।

এই কিয়ামুল লাইলে আপনি যত খুশি তিলাওয়াতের সুযোগ পাবেন, পাশাপাশি মধ্যরাতে মহান রবের সামনে দাঁড়িয়ে একান্তে ইবাদতে লিপ্ত হতে পারবেন...। বস্তুত কতই-না উত্তম আমল এটি! জান্নাতের পথে কতই-না সংক্ষিপ্ত রাস্তা এটি!!

ইচ্ছে করলে তখন আপনি বিস্মৃত অংশ ইয়াদ করার জন্য কুরআন তিলাওয়াতে রত হতে পারবেন, আবার চাইলে মুখস্থকৃত অংশগুলো ভালোভাবে রপ্ত করতে বারবার নামাজে দাঁড়িয়ে তা তিলাওয়াত করতে পারবেন।

আপনি চাইলে এশার নামাজের পরপর কিয়ামুল লাইল আদায় করতে পারেন, আবার চাইলে মধ্যরাতে বা রাতের শেষ প্রহরেও তা পড়তে পারেন—আর এটাই [রাতের শেষ প্রহর] উত্তম।

মোটকথা, যখন আর যে পরিমাণ কিয়ামুল লাইলই হোক, সর্বাবস্থায় এটি এক মহৎ আমল এবং বিরাট প্রতিদানপ্রাপ্তির বিষয়! আল্লাহর কাছে নিবেদন, তিনি আমাদের এই মহা নিয়ামত দান করুন।

আয়েশা রা. [আব্দুল্লাহ বিন আবু কায়স রহ.-কে] বলেন, "তুমি কখনো কিয়ামুল লাইল ছেড়ো না। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো তা পরিত্যাগ করতেন না। তিনি যদি অসুস্থ থাকতেন বা অলসতা বোধ করতেন, তবে তা বসে বসে আদায় করতেন।"[৪৬]

বিশেষত, কুরআন হিফজ করার পর কিয়ামুল লাইল ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হোন! মনোযোগ দিয়ে দেখুন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী উপদেশ দিচ্ছেন! আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ, তুমি অমুক ব্যক্তির মতো হয়ো না, যে একসময় কিয়ামুল লাইল আদায় করত, কিন্তু পরে তা ছেড়ে দিয়েছে...।"[৪৭]

---

[৪৬]. *সুনানে আবু দাউদ*: ১৩০১।
[৪৭]. *সহিহ বুখারি*: ১১৫২।

প্রধান নিয়মগুলোর সংক্ষিপ্ত স্মরণিকা

১. আপনার এ আমল কেবল আল্লাহর জন্য ইখলাসপূর্ণ করুন এবং এতে বেশি বেশি নেক নিয়ত অন্তর্ভুক্ত করুন।

২. দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করুন। আজই আপনি নিজে, আপনার স্ত্রী-সন্তান এবং ভাই-বোনদের নিয়ে হিফজ শুরু করে দিন। 'অচিরেই শুরু করব' বাক্যের প্রবঞ্চনা থেকে বেঁচে থাকুন।

৩. যে কাজের নিয়ত করেছেন, তার মূল্য অনুধাবন করুন।

৪. হিফজের পাশাপাশি তদনুযায়ী আমলের প্রতি মনোযোগ প্রদান করুন। আপনার ইলম যেন আপনার আমলকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে না-পারে...।

৫. গোনাহ ছেড়ে দিন। অতীতের গোনাহর জন্য ইস্তেগফার করুন, সামনে তা থেকে বেঁচে থাকার প্রতিজ্ঞা করুন।

৬. একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন আপনার জন্য সততাপূর্ণ নিয়ত, নির্ভুল হিফজ এবং নেক আমল সহজ করে দেন।

৭. সর্বদা তাফসিরের গ্রন্থাদির সহায়তা নিন—যেন আপনি কুরআনের আয়াতসমূহের মর্ম বুঝতে পারেন।

৮. দ্রুত সময়ে এবং শুদ্ধরূপে তাজউইদ শিখে নিন।

৯. এক মাস বা তারও কম সময়ে একবার করে কুরআন খতমের চেষ্টা করুন।

১০. হিফজকৃত অংশ নামাজে পড়ার প্রতি আগ্রহান্বিত হোন, বিশেষত কিয়ামুল লাইলে।

কুরআন হিফজের সহায়ক নিয়মকানুন

কুরআনুল কারিম হিফজের ক্ষেত্রে এগুলোও খুব গুরুত্বের দাবি রাখে। তবে তা প্রথমোক্ত প্রধান নিয়মনীতির বিকল্প হতে পারবে না কখনোই। আমি জানি, হিফজে আগ্রহী অনেকেই এই সহায়ক নিয়মনীতির ওপরই পূর্ণভাবে নির্ভর করতে চায়; তবে সত্য বলতে, এটি কস্মিনকালেও সম্ভব নয়! কেননা, আপনি এসব সহায়ক নিয়মনীতির আলোকে সার্বিক প্রস্তুতি নিলেন, কিন্তু উল্লিখিত দশটি বিষয়ের তোয়াক্কা করলেন না—তাহলে নিশ্চিত থাকুন, আপনি কিছুতেই হিফজ সম্পন্ন করতে পারবেন না। আর যদি কোনোমতে আপনি হিফজ করেও ফেলেন, তবে সেটি প্রকৃতপক্ষে আপনার পক্ষের বদলে বিপক্ষেই যাবে...। কেননা, কী-করে আপনি হাফিজে কুরআন হয়ে গেলেন, অথচ আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি নিষ্ঠাবান নন, কুরআন অনুযায়ী আমল করেন না, গোনাহ ও পাপাচারে মত্ত থাকেন—অথচ আপনার কুরআন আপনাকে সে-সব অনাচার থেকে বিরত রাখতে পারে না!!

সারকথা হচ্ছে, এই সহায়ক নিয়মনীতি যদিও-বা আপনাকে মুগ্ধ করে থাকে, তবু প্রথমোক্ত প্রধান বিষয়াদির কথা ভুলে যাবেন না একদম! কেননা, সেগুলোই হচ্ছে মূলত আপনার উত্তম সহায়ক।

হিফজের সহায়ক দশটি পদ্ধতি

সুস্পষ্ট পরিকল্পনা

প্রতিটি কর্মের সফলতার জন্যই একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা থাকতে হয়, আবার প্রতিটি পরিকল্পনার সামনেই একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকতে হয়। উল্লেখ্য, এখানে সেই লক্ষ্যটি হলো পূর্ণাঙ্গভাবে কুরআনুল কারিমের হিফজ করা। আপনি যদি এ বিষয়টি মাথায় না রেখে হিফজ করা শুরু করেন, তবে আপনি সফল হবেন নাকি ব্যর্থ হবেন, তার কোনো নিশ্চয়তা আপনি দিতে পারবেন না...। তবে পরিকল্পনাকালে আপন পরিস্থিতির বিষয়টি সামনে থাকাও জরুরি। কারণ, এটি ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন হতে পারে, অতএব সেটি মাথায় রেখেই কার্যসম্পাদন করতে হবে। দেখা যায়, কোনো ব্যক্তির ধী-শক্তি প্রবল, সে দ্রুত হিফজ করতে পারে, আবার অন্য এক ব্যক্তি তার একদমই বিপরীত; তুলনামূলকভাবে কেউ অনেক সময় পায়, কিন্তু অন্য একজনের ততটা সময় হয় না; কোনো ব্যক্তি দ্বীনের দাওয়াতের কাজ করে, বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা করে—অতএব, তার হিফজুল কুরআনের প্রয়োজনীয়তা যতটা, যার এসবের দায়িত্ব নেই, তার প্রয়োজন অবশ্যই প্রথমজনের মতো ততটা নয়...।

সুতরাং, নানাজনের নানান অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের পরিকল্পনাও ভিন্ন ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। আর প্রতিটা মানুষই যেহেতু তার আপন অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত, সুতরাং সে-মতেই তার আপন পরিকল্পনা সাজানো উচিত...।

এ ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সময় নির্ধারণ করে নেওয়া। আপনি যদি পূর্ণ কুরআন হিফজ করতে চান, তাহলে একটি সময়সীমা নির্ধারণ করা জরুরি। তিন বছর, পাঁচ বছর, দশ বছর, তারচেয়েও বেশি বা

কম যা-ই হোক, তা নির্দিষ্ট করে নিন। পাশাপাশি, এর জন্য আপনার আরও প্রয়োজন একটি সুবিন্যস্ত সিলেবাস ও রুটিন প্রণয়ন করা—যেমন প্রথম বছরে আপনি কতটুকু হিফজ করবেন, দ্বিতীয় বছরে কতটুকু হিফজ করবেন...।

পাঁচ বছরে হিফজ সম্পন্ন করা

এ ব্যাপারে আমার পরামর্শ হলো, আপনি পাঁচ বছরে হিফজ পূর্ণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করুন—অর্থাৎ আপনি যদি একেবারে প্রথম থেকে মুখস্থ করা শুরু করে থাকেন...। আর যদি কুরআনের অর্ধেক বা এক-চতুর্থাংশ পূর্ব থেকেই আপনার মুখস্থ থাকে, সে ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে সময়সীমাটাও কমে আসবে...।

এ ক্ষেত্রে পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তাব উপস্থাপনের কারণ হচ্ছে, আমার ব্যক্তিগত হিসেবনিকেশ এবং পূর্ণ, অর্ধ ও তারচেয়ে কম অংশের হাফেজদের অভিজ্ঞতা জানার মাধ্যমে আমি এই ফলাফলে থিতু হয়েছি। পাশাপাশি এই বিষয়েও চিন্তাভাবনা করেছি, একটি নির্দিষ্ট সময়ে হিফজে আগ্রহী একজন ব্যক্তি কতটুকু অংশ মুখস্থ করতে পারে...।

আমি ফলাফল বের করলাম, স্বাভাবিকভাবে সপ্তাহে এক 'রুবু' কুরআন হিফজ করা যেতে পারে। আবার কেউ হয়তো এরচেয়ে বেশিও করতে পারবে, আবার কেউ হয়তো এই পরিমাণও করতে পারবে না—তবে আমি -রুবু'-এর কথা যেটি বললাম, সেটিই হচ্ছে মাঝামাঝি পরিমাণ।

আমরা জানি, কুরআনের একেকটি পারা আটটি 'রুবু'-তে বিভক্ত। অতএব, এই পরিকল্পনামতে এক পারা হিফজ করতে আপনার আট সপ্তাহ সময় লাগবে। আর এই হিসেবে ছয় পারা (৪৮ 'রুবু') হিফজ করতে আপনার সময় লাগবে ৪৮ সপ্তাহ [৩৩৬ দিন]। আর এটা হচ্ছে কুরআনের এক-পঞ্চমাংশ, কেননা কুরআনে মোট ত্রিশ পারা রয়েছে।

পাশাপাশি আমরা জানি, ৫২ সপ্তাহে এক বছর হয়, সুতরাং ৪৮ সপ্তাহ চলে গেলে আপনার হাতে থাকছে আরও চার সপ্তাহ। আর আমার পরামর্শ হলো, এ সময়টিতে আপনি এ বছরে কুরআনের হিফজকৃত অংশ তথা এক-পঞ্চমাংশের পুনর্পাঠ (রিভিশন) করুন। দ্বিতীয়ত আমি বলব, আপনার

পুনর্পাঠের জন্য রমজান মাসকে নির্ধারণ করুন। কেননা, অধিকাংশ মুসলিমই তখন কুরআন পাঠের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সময় পায়। তখন আপনি ফজরের আগে কিয়ামুল লাইলেরও অনেক সুযোগ পাবেন, আবার ওই সময়ে তারাবিতে ইমামের পেছনে পূর্ণ কুরআন শ্রবণেরও সুযোগ পাচ্ছেন, চাইলে রাতের শেষ প্রহরেও ইমামের কিরাআত শুনতে পারছেন তাহাজ্জুদের নামাজে। আর আল্লাহ যদি আপনাকে ইতিকাফের তওফিক দেন, তাহলে তো তা পুনর্পাঠের জন্য সুবর্ণ সুযোগ!

অতএব দেখা গেল, এই পরিকল্পনামতে বছরে আপনি এক-পঞ্চমাংশ কুরআন হিফজ করতে পারছেন এবং পাঁচ বছরেই ইনশাআল্লাহ আপনার পূর্ণাঙ্গ কুরআনের হিফজ সমাপ্ত হয়ে যাচ্ছে...।

অনেকের হয়তো এরই মধ্যে অলসতা এসে গেছে—বলছে: আমি তো এটাকে আরও সহজ ও দ্রুত-সমাধাযোগ্য কিছু ভেবেছিলাম...। কিন্তু এখন দেখছি সে-ই পাঁচ বছর এটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে! এ তো দীর্ঘ সময়!

আমি বলি—প্রিয় ভাই, জীবনের কত পাঁচ-বছর চলে গেল, অথচ আপনি কুরআনের এতটুকু অংশও মুখস্থ করতে পারেননি! আমরা একটু ভেবে দেখি তো আমাদের গত পাঁচ বছর কীভাবে অতিবাহিত হয়েছে! বাস্তবে সেই সময়টুকু কিন্তু খুবই নিকটের...। অতীতের কথা ভাবলে দেখতে পাবেন, গত পাঁচটি বছরে যা ঘটেছে, তা এই যেন গতকালের কথা...। সময় আসলে খুব দ্রুতই চলে যায়—যেকোনো অবস্থাতেই দ্রুত অতিবাহন সময়ের স্বভাব...। আপনি সময় দ্বারা উপকৃত হোন বা ক্ষতিগ্রস্ত, সময় কিন্তু বয়েই যাবে...।

তবে স্মরণীয় বিষয় হচ্ছে, পাঁচ বছরমেয়াদি এ পরিকল্পনা শুধু তার জন্য, যিনি একদম প্রথম থেকে শুরু করতে যাচ্ছেন। পক্ষান্তরে আপনার যদি পাঁচ পারা মুখস্থ থাকে, তাহলে আপনার লাগবে আর চার বছর; আপনার যদি দশ পারা মুখস্থ থাকে, তাহলে আপনি মাত্র তিন বছরেই বাকিটা হিফজ করে নিতে পারবেন!

মনে রাখবেন, গতকালের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় আজ; আজকের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় আগামীকাল! ইনশাআল্লাহ।

সংঘবদ্ধ হয়ে শুরু করা

অনেক ক্ষেত্রে এমন হয়, কারও কোনো আমলের প্রতি প্রবল আগ্রহ জন্মে আর সাহস করে সে কাজও শুরু করে। পাশাপাশি এ কাজে তার নিয়তও ঠিক থাকে আর তা শেষ করার প্রবল স্পৃহাও লালন করে অন্তরে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না-যেতেই তার উদ্যম-সাহস নড়বড়ে হয়ে পড়ে, এমনকি সেই আমল ধীরগতি পেয়ে একসময় থেমেই যায়...।

কী ঘটল? শয়তানের অনুপ্রবেশ!

মুমিন ব্যক্তিকে কল্যাণকর কাজ থেকে দূরে রাখতে শয়তান ধীরে ধীরে তার অন্তরে অনুপ্রবেশ করে। তার সামনে বিভিন্ন প্রতিকূলতা হাজির করে, বিবিধ সমস্যা উপস্থাপন করে; ফলে মুমিন ব্যক্তি সে-সকল কাজ থেকে দমে যায়, যেগুলোর প্রতি একসময় সে প্রবল আগ্রহ বোধ করত।

এ ক্ষেত্রে শয়তানকে প্রতিহত করার উত্তমতম পদ্ধতি হলো, হিফজুল কুরআনে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে আপনারা ভাই, বন্ধু বা পরিচিত ক-জন মিলে একজোট হয়ে যান। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى﴾

"সৎকর্ম ও খোদাভীতির ক্ষেত্রে একে অন্যকে সহযোগিতা করো।"

[সুরা মায়িদা: ২]

ফলে আপনার যখন অবসাদ আসবে—আর এটা আসবেই—তখন আপনার ভাই আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেবে, আর যদি আপনার ভাইয়ের অবসাদ আসে, তখন আপনি তাকে স্মরণ করিয়ে দেবেন...। এভাবে আপনারা সৎকর্ম ও খোদাভীতির ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগী হয়ে উঠলেই শয়তান হবে পরাজিত।

উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "শয়তান বিচ্ছিন্নজনের সাথে থাকে এবং দুজন হতে তুলনামূলক দূরে অবস্থান করে।"[৪৮]

তাই আপনি যখন হিফজের প্রতি সবলতা অনুভব করেন, পাশাপাশি যথেষ্ট অবসরও থাকে, তখন দুয়েকজন বন্ধুর সাথে জোট করে ফেলুন। কয়েকজন মিলে সুরা বাকারা হিফজ করে ফেলুন, আরেকজনের সাথে সুরা আরাফ মুখস্থ করে ফেলুন...।

তবে আমার একটি উপদেশ হচ্ছে, আপনি একসাথে বেশি অংশ হিফজ করতে যাবেন না। কেননা, এটি আপনার মধ্যে বিরক্তি ও অবসাদ তৈরি করতে পারে, আবার এতে হয়তো আপনার হিফজের আমল পুরোপুরি বন্ধও হয়ে যেতে পারে...। আর বাস্তবতা হচ্ছে, ধারাবাহিক স্বল্প কর্মও বিচ্ছিন্ন দীর্ঘ কর্মের চেয়ে উত্তম।

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা মধ্যমপন্থায় আমল করে যাও। জেনে রেখো, তোমাদের কাউকে তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না। আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল হলো যা সদাসর্বদা নিয়মিত করা হয়—যদিও তা সামান্য হয়।"[৪৯]

পকেটে ছোট কুরআন রাখা

পকেটে একটি ছোট কুরআন শরিফ রাখলে আপনার হিফজ অনেকটা সহজ হবে। আমি অনেক হাফেজের কথা জানি, যারা ৮০ ভাগেরও বেশি হিফজ সম্পন্ন করেছে তাদের ছোট কুরআন থেকে বিভিন্ন জায়গায় ও সময়ের বিরতিগুলো কাজে লাগিয়ে! আয়োজন করে বিশেষভাবে হিফজের জন্য বসা

[৪৮]. *জামে তিরমিযি*: ২১৬৫।
[৪৯]. *সহিহ বুখারি*: ৬৪৬৪, *সহিহ মুসলিম*: ২৮১৮।

তাদের নিকট জরুরি ছিল না। কেননা, সাধারণত অধিকাংশেরই দিনের লম্বা একটা সময় বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, এক কাজের পর আরেকটি এসে ভিড় করে। তবে এই ব্যস্ততার মাঝেই সময়ের অল্পকিছু ফাঁকফোকরও পাওয়া যায়—আর ইচ্ছে করলে সেগুলো আমরা হিফজের কাজে ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু অনেক সময় কুরআন শরিফের অভাবে সময়গুলো অযথা নষ্ট হয়, অতএব সে সময় পকেটে রাখা এই ছোট কুরআনটি আপনার অনেক কাজে আসবে।

ধরুন, আপনি পাবলিক বাসে করে কোথাও যাচ্ছেন, সেখানে প্রত্যেকদিন ১৫ মিনিট, আধা ঘণ্টা বা কখনো এক ঘণ্টা সময়ও চলে যাচ্ছে। অতএব, আপনি চাইলে এই সময়টা কাজে লাগাতে পারেন। এমনইভাবে পথ চলতে চলতে আপনি চাইলে হিফজকৃত অংশের পুনর্পাঠও সেরে নিতে পারেন। প্রথমে একবার গত সপ্তাহে হিফজ করা অংশ পড়লেন, তারপর আরও পূর্বের অংশগুলো পড়তে থাকলেন—একবার শেষ হলে বারবার পড়তে থাকলেন। এতে আপনার হিফজও শক্তিশালী হবে, পাশাপাশি প্রচুর সওয়াবেরও অধিকারী হবেন! এ-ক্ষণে হঠাৎ কোনো আয়াতে আটকে গেলে পকেট থেকে ছোট কুরআন শরিফটি বের করে দেখে নিয়ে আয়াতটি ঠিকঠাকভাবে তিলাওয়াত সম্পন্ন করে নিলেন...।

অথবা কোনো অফিস, লাইন বা কোথাও কিছুর অপেক্ষায় আছেন, কলেজ-ভার্সিটির লেকচারের বিরতির সময়ে বসে, মসজিদে আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে—চাইলে এ সময়গুলোও আপনি কাজে লাগাতে পারেন, চাই একটা আয়াতই হোক না-কেন! কেননা, এভাবে আয়াতে আয়াতে হবে 'রুবু', আর 'রুবু' 'রুবু' মিলে একসময় পুরো কুরআনুল কারিমই শেষ হয়ে যাবে—ইনশাআল্লাহ![৫০]

---

৫০. স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের জন্য পকেটে কুরআন রাখার বিষয়টি আরও অনেক সহজসাধ্য। স্মার্টফোনে কুরআনের বিভিন্ন অ্যাপ পাওয়া যায়, যা হিফজে আগ্রহী এবং কুরআন তিলাওয়াত করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য একটি উত্তম মাধ্যম হতে পারে। আল্লাহ তাআলা আমাদের স্মার্টফোনকে ফেতনা থেকে রক্ষা করে আমলের মাধ্যম বানিয়ে দিন। আমিন। (সম্পাদক)

চার

ইমাম সাহেবের তিলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শোনা

হিফজুল কুরআনে আগ্রহী ব্যক্তির অবশ্যই মসজিদে জামাতে নামাজ পড়ার ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে। আমার পরামর্শ থাকবে, আপনি এমন কোনো মসজিদ বাছাই করে নিন, যার ইমাম সাহেব নিজে হাফেজ এবং তাজউইদের নিয়মকানুন মেনে বিশুদ্ধ তিলাওয়াত করেন—বিশেষত, তিনি যদি সুন্দর কণ্ঠের পাশাপাশি আয়াতগুলোর মর্মবোদ্ধা কেউ হন...। হাফেজ ইমাম সাহেব কুরআনের বিভিন্ন অংশ থেকে তিলাওয়াত করে থাকেন, এই সুযোগে তার সাথে আপনিও আপনার গতকাল, গত মাস এমনকি গত বছরের হিফজ করা কোনো অংশও শুনে নিতে পারবেন। পাশাপাশি, আপনার মুখস্থ করা হয়নি, এমন অংশের তিলাওয়াতও বারবার শুনতে পারায় পরবর্তী সময়ে তা হিফজ করা আপনার জন্য সহজ হয়ে উঠবে।

'জাহরি' নামাজ (যে নামাজে ইমাম সাহেব উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়েন) তথা ফজর, মাগরিব এবং এশার নামাজে ইমামের তিলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করুন। কোনো আয়াত না বুঝলে সেটা স্মরণে রাখুন, এরপর বাসায় ফিরে তাফসিরের কোনো গ্রন্থ খুলে সেই আয়াতের তাফসিরটুকু দেখে নিন। এতে যেমন আপনার হিফজ শক্তিশালী হবে, সেইসাথে আয়াতের তাফসিরও জানতে পারলেন এবং পরবর্তী সময়ে এর ওপর আমলও করতে পারবেন।

কোনো আয়াত শুনে সন্দেহ হলে নামাজের পর মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগেই কুরআন শরিফ খুলে তা দেখে নিন। যাতে আয়াতের শুদ্ধাশুদ্ধি এবং অক্ষর-শব্দের সঠিক স্থান রপ্ত হয়ে যায়। এর দ্বারা নিজের হিফজ শক্তিশালী করা এবং অর্থ অনুধাবনের বিষয়টি ছাড়াও আপনি নামাজের খুশুখুজুর ব্যাপারটি আদায় করে নিলেন। কেননা, শুধু শরীর নয়; বরং আপনার মনও পুরোপুরিভাবে নামাজের সাথেই ছিল, বিধায় আপনার সওয়াবের পরিমাণও বিরাটাকার ধারণ করল। যেমন হযরত আবু বকর বিন আবদুর রহমান রা. থেকে বর্ণিত রয়েছে, "একদা আম্মার বিন ইয়াসির রা.

দু-রাকাত নামাজ আদায় করলে আবদুর রহমান বিন হারেস তাকে বললেন, হে আবুল ইয়াকযান [তাঁর উপনাম], মনে হয় নামাজ একটু হালকা করে পড়লেন! আম্মার রা. বললেন, আমি কি জরুরি কোনো বিষয় ছেড়ে দিয়েছি? আবদুর রহমান রা. বললেন, না, তবে মনে হয় নামাজটি একটু ছোট হয়ে গেল। আম্মার রা. বললেন, ভুল হওয়ার আশঙ্কা ছিল, তাই ছোট করে পড়ে নিলাম। কেননা, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কোনো লোক হয়তো নামাজ পড়ে, অথচ সে নামাজের এক-দশমাংশ, এক-নবমাংশ, এক-অষ্টমাংশ, এক-সপ্তমাংশ (এভাবে তিনি সর্বশেষ সংখ্যা পর্যন্ত বললেন) আদায়কারী বলে গণ্য হয়েছে...।"[৫১] [অর্থাৎ ব্যক্তির মন নামাজে যতটুকু হাজির ছিল, সেই পরিমাণেই তাকে নামাজি বলে গণ্য করা হবে]।

সহজ অংশ দিয়ে শুরু করা

এটা একদমই জরুরি নয় যে কুরআনের বিন্যাসে বা একদম প্রথম সুরা থেকেই আপনাকে হিফজ শুরু করতে হবে। বরং আমি বলব, সহজ অংশগুলো দিয়ে শুরু করুন। এতে সেগুলো আপনি দ্রুত সময়ে হিফজ করে ফেলতে পারবেন এবং শুরুর দিকেই বেশ ভালো পরিমাণ আপনার হিফজ হয়ে যাবে, যা নিঃসন্দেহে আপনাকে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে, উৎসাহ জোগাবে। কেননা, আপনার বুকে এক-পঞ্চমাংশ কুরআন থাকলে আপনি যে আগ্রহ-উদ্দীপনা পাবেন, অর্ধেক কুরআন মুখস্থ থাকলে কিন্তু তার বরাবর হবে না...। যার একেবারেই কিছু মুখস্থ নেই, একই কথা প্রযোজ্য হয় তার ক্ষেত্রেও...।

কুরআনের পারাগুলোর সহজতা-কাঠিন্য আপেক্ষিক ব্যাপার। কোনো সুরা হতে পারে আমার জন্য সহজ, কিন্তু আপনার জন্য কঠিন, আবার এর উল্টোটি হওয়াও সম্ভব। তবুও, কিছু সুরা সহজ হওয়ার ব্যাপারে অনেক

[৫১]. *মুসনাদে আহমাদ*: ১৮৮৭৯।

হাফেজই একমত। এ জন্য আমি পরামর্শ দেবো, সেগুলো দিয়ে হিফজ শুরু করুন—অর্থাৎ যে-সুরাগুলো সাধারণত আমরা নামাজে শুনতে পাই এবং যেগুলোতে নানান ঘটনা বিবৃত রয়েছে...। উদাহরণস্বরূপ:

১. ত্রিশতম পারা [আমপারা]

২. উনত্রিশতম পারা

৩. সুরা বাকারা

৪. সুরা আলে ইমরান

অনেকে অবশ্য আকারে বড় হওয়ায় শেষোক্ত দুটি সুরা মুখস্থ করতে ভয় পায়, তবে বাস্তবতা কিন্তু তার একেবারেই বিপরীত। কেননা—

প্রথমত: এ সুরা দুটির অধিকাংশ আয়াতই নামাজে আমরা ইমাম সাহেবের পেছনে শুনে থাকি।

দ্বিতীয়ত: সুরা দুটিতে বহু ঘটনার কথা বর্ণিত রয়েছে, অনেকগুলো আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পেছনে রয়েছে বিভিন্ন শানে নুজুল (আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পটভূমি); ফলে, যে ব্যক্তি সেই ঘটনাগুলো জানে, তার জন্য সেই ঘটনাসংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো হিফজ করা সহজ হবে। যেমন: সুরা বাকারায় আলোচনা করা হয়েছে নবীজির সাথে বনি ইসরাইলের [ইহুদি-খ্রিষ্টান] বিভিন্ন আচরণের কথা; আলোচিত হয়েছে প্রসিদ্ধ অনেক বিধানের কথা—রোজা, হজ, ঋণ, সদকা, সুদ ইত্যাদি।

এ ছাড়াও রয়েছে আয়াতুল কুরসি, রয়েছে প্রসিদ্ধ শেষ কয়েক আয়াত, তালুতের ঘটনা—আর এগুলো প্রায় সব মুসলমানই জানে।

অতঃপর রয়েছে সুরা আলে ইমরান। সেখানে আলোচনা করা হয়েছে ইসলামের ব্যাপারে আহলে কিতাবদের বিভিন্ন সংশয় ও তার জবাব নিয়ে। আরও আলোচনা রয়েছে ইসলামের প্রসিদ্ধ যুদ্ধ ‘গাযওয়ায়ে উহুদ’ নিয়ে। তা ছাড়া জাহরি নামাজে পড়া হয়, এটিও সেই প্রসিদ্ধ সুরাগুলোর অন্যতম।

তৃতীয়ত: সবচেয়ে বড় কথা হলো, এ সুরা দুটি কেয়ামত দিবসে তাদের ধারণকারীর পক্ষে কথা বলবে!

৫. সুরা ইউসুফ

৬. সাতাশতম পারা

৭. সুরা ইয়াসিন

৮. সুরা কাসাস

৯. সুরা আনফাল

১০. সুরা আহযাব

১১. সুরা লুকমান

১২. সুরা সোয়াদ

তেমনইভাবে, যে-সব সুরার কোনো বিশেষ ফজিলত রয়েছে বা যেগুলো তিলাওয়াতের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, সেগুলো দ্বারাও শুরু করতে পারেন। কেননা, সেগুলো পড়তে কুরআন শরিফ নিয়ে নির্দিষ্ট পরিবেশ সৃষ্টি বা আলাদা আয়োজনের প্রয়োজন পড়বে না। যেমন:

১. সুরা কাহফ

ইমাম দারেমি রহ. হজরত আবু সাঈদ খুদরি রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জুমার দিন যে ব্যক্তি সুরা কাহফ পড়ে, তার পায়ের নিচ থেকে এক আলো বিচ্ছুরিত হয়ে ঊর্ধ্বাকাশ পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়, যা কিয়ামতের দিন তার জন্য আলোকবর্তিকা হবে। তা ছাড়া পাঠকারীর জন্য এই দুই জুমার মাঝের গোনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হয়।"[৫২]

২. সুরা মুলক

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কুরআনের মধ্যে ত্রিশ আয়াতবিশিষ্ট একটি সুরা আছে, যা কারও পক্ষে সুপারিশ করলে তাকে মাফ করে দেওয়া হয়। সুরাটি হলো, 'তাবারাকাল্লাযি বিয়াদিহিল মুলক' (অর্থাৎ সুরা মুলক)।"[৫৩]

---

[৫২]. *আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব*: ১/২৯৮- হাদিস নং: ১০৯৮ [মাকতাবায়ে মুসতাফাল বাবিল হালাবি- সূত্র: মাকতাবায়ে শামেলা]।

[৫৩]. *জামে তিরমিযি*: ২৮৯১।

৩. সুরা সাজদা ও সুরা ইনসান [সুরা দাহর]

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন ফজরের নামাজে الٓمّٓ تَنْزِيْلُ السجدة [সুরা সাজদা] এবং ﴿هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾ [সুরা ইনসান/দাহর]—এ দুটি সুরা তিলাওয়াত করতেন।”[৫৪]

৪. সুরা জুমুআ ও সুরা মুনাফিকুন

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার নামাজে সুরা জুমুআ ও সুরা মুনাফিকুন পাঠ করতেন।”[৫৫]

৫. সুরা কাফ

উম্মে হিশাম বিনতে হারেসা বিন নুমান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “সুরা কাফ আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে শুনে শুনেই মুখস্থ করে ফেলেছি, কারণ প্রত্যেক জুমার খুতবায় তিনি এটি পড়তেন। তিনি আরও বলেন, আমাদের ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেন একই চুলা ছিল।”[৫৬] [অর্থাৎ উভয়ের বাড়ির নৈকট্য এবং আল্লাহর রাসুলের অবস্থাদি সম্পর্কে তিনি কতটুকু জ্ঞাত ছিলেন, সে কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে এখানে]।

একটি বিষয় উল্লেখ করা জরুরি মনে করছি, সুরা ওয়াকিয়ার ফজিলত সংক্রান্ত লোকমুখে প্রচলিত হাদিসগুলোর সবগুলোই অত্যন্ত দুর্বল অথবা ‘মাওজু’ (বানোয়াট)।[৫৭]

---

[৫৪]. *সহিহ বুখারি*: ৮৯১।

[৫৫]. *সহিহ মুসলিম*: ৮৭৯।

[৫৬]. *সহিহ মুসলিম*: ৮৭৩।

[৫৭]. উল্লেখ্য, ড. সারজানি এখানে উদাহরণহীন রূপে অতি ব্যাপকভাবে মন্তব্য করেছেন, বিধায় তা জটিল, কেননা একেক অঞ্চলে একেক রকম বিষয় প্রচলিত থাকে। অতএব এ ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হচ্ছে, এই সুরা সংক্রান্ত ফজিলত জানতে উলুমুল হাদিসে প্রাজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হওয়া। (সম্পাদক)

এ ছাড়া, কিছু সুরা অপেক্ষাকৃত কঠিন হওয়ায় সেগুলো দিয়ে শুরু না-করারও পরামর্শ থাকবে। যেমন:

১. সুরা ইউনুস

২. সুরা ফাতির

৩. আটাশতম পারা

৪. সুরা নিসা

৫. সুরা নাহল

৬. সুরা আনকাবুত

৭. সুরা যুমার

তবে আমি পুনরায় বলছি, এই সহজতা-কাঠিন্যের নির্বাচন সকলের জন্য এক নয়; কেননা, একজনের কাছে যা সহজ, অন্যজনের কাছে সেটা নিতান্ত কঠিনও হতে পারে...। বস্তুত আল্লাহই তওফিকদাতা।

নির্দিষ্ট অনুলিপিতে হিফজ করা

কুরআন শরিফ বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে ভিন্ন ভিন্ন আকার ও লিপিতে (ফন্ট) প্রকাশিত হয়ে থাকে। যার ফলে কোনো অনুলিপির পৃষ্ঠা হয় বারো লাইনে, কোনোটির চৌদ্দ লাইনে, আবার কোনোটি হয় পনেরো লাইনে...। এমনইভাবে কোনোটিতে হয়তো লাইন শুরু হয় এক আয়াত দ্বারা, কিন্তু অপর অনুলিপির একই লাইন শুরু হয় ভিন্ন আয়াত দ্বারা—এমনকি কোনো সময় সুরাও ভিন্ন হয়ে যায়।

মানুষ তার নির্দিষ্ট কিছু ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে তথ্যসমূহ মস্তিষ্কে প্রেরণের মাধ্যমে তা মুখস্থ করে থাকে। অতএব, ব্যবহৃত ইন্দ্রিয়ের পরিমাণ যত বাড়ানো যাবে, মুখস্থ করা বিষয়গুলোও তত শক্তিশালী হবে।

এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, কোনোকিছু মুখস্থ করার ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তিও একটি ইন্দ্রিয়, ফলে আপনি কুরআনের যে অনুলিপি থেকে হিফজ বা তিলাওয়াত করবেন, সেটি সর্বদা একই রূপ রাখা কর্তব্য, যেন দর্শনেন্দ্রিয় তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং, একই ধরনের বিভিন্ন সাইজের কুরআন শরিফ কিনে কোনোটা ঘরে, কোনোটা অফিসে, কোনোটা গাড়িতে, কোনোটা মসজিদে আর কোনোটা আপনার পকেটে রাখুন। তখন আপনি যেখানেই যাবেন, তিলাওয়াতে একই ধরনের কুরআন থাকায় পৃষ্ঠাটি আপনার মস্তিষ্কে গেঁথে যাবে। পাশাপাশি হিফজের ক্ষেত্রে আপনি আল্লাহর নেয়ামত দৃষ্টিশক্তি কাজে লাগানোরও সুযোগ পেয়ে গেলেন...।

আমার পরামর্শ থাকবে, যিনি এখনো কুরআনের কোনো অনুলিপি নির্দিষ্ট করে হিফজ শুরু করেননি, তিনি যেন মদিনা মুনাওয়ারার অনুলিপিটি ব্যবহার করেন। এই কপির বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

১. বর্তমানে সবচেয়ে প্রচলিত অনুলিপি এটি। ফলে যেকোনো জায়গায় এবং যেকোনো সাইজের অনুলিপি হাতের কাছে পেয়ে যাওয়ায় তিলাওয়াত করতে আপনার সুবিধা হবে।

২. এর অনুলিপিটি একদম স্পষ্ট এবং লেখার অক্ষরবিন্যাসও সহজপাঠ্য।

৩. এর বিন্যাস সুন্দর। এতে একই আয়াত দুই পৃষ্ঠায় ভাগ হয়ে যায়নি, বরং অধিকাংশ পৃষ্ঠায়ই আয়াত শেষ হয়ে গেছে। এটা নিঃসন্দেহে হিফজের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

মুখস্থের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়শক্তির আলোচনা প্রাসঙ্গিক হওয়ায় সেগুলো নিয়েও আমরা কথা বলতে পারি:

১. দৃষ্টিশক্তি: হিফজ করার সময় কুরআনের পৃষ্ঠায় দৃষ্টি বুলানো হয়। আর কুরআন শরিফে দৃষ্টি দেওয়াও একটি ইবাদত।

২. শ্রবণেন্দ্রিয়: অপেক্ষাকৃত উচ্চ আওয়াজে পড়লে—মসজিদে তা উচিত নয়—শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সেটা মস্তিষ্কে প্রবেশ করে।

৩. লেখ্যশক্তি: যে-সব আয়াত হিফজ করা আপনার জন্য বেশি কঠিন মনে হয়, সেগুলো বারবার লিখে চর্চা করতে পারেন।

হিফজ শক্তিশালী হওয়ার আগে সামনে না-এগোনো

কখনো হিফজ শেষ করতে আপনি অধীর আগ্রহী হয়ে উঠতে পারেন। তাই দেখা যাবে, হিফজকৃত অংশকে পোক্ত না-করেই আপনি রুকু থেকে রুকু, সুরা থেকে সুরা দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু অভিজ্ঞতা বলছে, যা মুখস্থের ক্ষেত্রে তেমন পরিশ্রম সাধিত হয় না, তা মস্তিষ্কে বেশিদিন স্থায়ী হয় না।

অতএব, এক আয়াত থেকে অন্য আয়াত বা এক রুকু থেকে অন্য রুকুতে ততক্ষণ যাওয়া উচিত নয়, যতক্ষণ প্রথম আয়াত বা রুকু মুখস্থের ব্যাপারে আশ্বস্থ না-হন। অন্যথায় হিফজের পেছনে ব্যয় করা সময়টুকু বাস্তবে তেমন উপকারী কোনো কাজে লেগেছে বলে বিবেচিত হবে না।

সুরাগুলো আলাদা আলাদাভাবে আত্মস্থ করা

হিফজের সুবিধার্থে বড় সুরাগুলো আমরা ভাগ ভাগ করে মুখস্থ করব। যেমন: আজ দু-আয়াত, কাল দু-আয়াত—এভাবে সপ্তাহে এক রুকু হিফজ পূর্ণ করে ফেলা যাবে। আর এই রীতিতে এক মাসে, দু-মাসে অথবা এরচেয়ে কম বা বেশি সময়ে আপনার একটা পূর্ণ সুরা মুখস্থ হয়ে যাবে।

এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় হচ্ছে, যেকোনো একটি সুরার হিফজ পূর্ণ হওয়ার পর শুরুর আয়াত থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত মস্তিষ্কে গেঁথে নেওয়া চাই, তাহলে কুরআনের সমস্ত সুরা আলাদা আলাদাভাবে আমাদের স্মৃতিতে বসে যাবে। এর জন্য আমাদের প্রত্যেকটি সুরা শেষ হওয়ার পর পুরো সুরাটি বারবার তিলাওয়াত করা জরুরি।

অনেক হাফেজের ক্ষেত্রে এমন হয়, তারা এই গুরুত্বপূর্ণ ধাপটি অনুসরণ না-করার ফলে যে অংশ নিয়ে বর্তমান চর্চা অব্যাহত রাখে, তা ভালোভাবে শোনাতে পারলেও যখন একই সুরার পরের অংশে এগিয়ে যায়, তখন পূর্ববর্তী সেই অংশ শোনাতে গেলে আটকে যায়—আর স্মরণ করতে পারে না। তবে কেউ যদি তখন সেই অংশের শুরুটা বলে দেয়, তখন আবার সে নির্বিঘ্নে পুরো আয়াত বলে ফেলতে পারে, কিন্তু পরবর্তী অংশের শুরুতে গিয়ে আবারও বাঁধে একই বিপত্তি...। অতএব, শক্তিশালী হিফজ ও সাবলীল তিলাওয়াতের জন্য আমরা কোনোমতেই এই বিষয়টি এড়িয়ে যেতে পারি না—বিশেষত যে-সকল হাফেজ নামাজের ইমামতি করেন; তদুপরি যারা লম্বা কিরাআতের নামাজ, যেমন: ফজর, তারাবিহ এবং তাহাজ্জুদের ইমামতি করেন।

‘আয়াতে মুতাশাবিহাত’ (সাদৃশ্যপূর্ণ আয়াতসমূহ)-এর প্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখা

কুরআনুল কারিমের বহু আয়াতে পারস্পরিক সাদৃশ্য রয়েছে। কখনো কখনো এক সুরার কোনো আয়াতের সাথে অন্য সুরার আয়াতের শুধু একটি শব্দ, আবার কখনো শুধু একটি অক্ষরের পার্থক্য থাকে—আবার কখনো আয়াতগুলো হুবহুও মিলে যায়! শুরুতে ব্যাপারটি সহজই থাকে, কিন্তু ধীরে ধীরে হিফজের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার পর সেগুলোর পার্থক্যের দিকে খেয়াল না-রাখলে হাফেজদের জন্য তা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়...।

তাই আমি সতর্ক করে দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি, কোনো আয়াত হিফজ করতে গিয়ে যদি মনে হয় যে একইরকম আয়াত গত মাসে বা গত বছরে আপনি হিফজ করেছেন, তাহলে সাথে সাথে সেই আয়াতটি বের করুন এবং দুই আয়াতকে সূক্ষ্মভাবে তুলনা করে পার্থক্যের জায়গাটি স্পষ্ট করুন। আর যদি তাফসিরের গ্রন্থ ঘাঁটাঘাঁটি করে এই সামান্য অমিলের মূল

কারণ বের করতে পারেন, তাহলে তো আরও ভালো। সে-সকল গ্রন্থে অনেক সময় এই মিল-অমিলের কারণ স্পষ্ট আকারে পেয়ে যাবেন, আবার অনেক সময় চেষ্টা করেও আয়াতদ্বয়ের মাঝে পার্থক্যের হিকমত (সূক্ষ্ম কারণ) বের করতে পারবেন না। তবুও, এই দু-আয়াতের তুলনা ও তাফসির গ্রন্থের শরণাপন্ন হওয়া সর্বাবস্থায়ই আপনার জন্য উপকারী বলে বিবেচিত হবে।

আয়াতসমূহের সাদৃশ্যের কিছু উদাহরণ:

১. সুরা আনআমের একটি আয়াত (১৫১) হলো,

﴿وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾

এদিকে সুরা বনি ইসরাইলের একটি আয়াত (৩১) হলো,

﴿وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾

আয়াত দুটিতে অনেকটা মিল থাকলেও উভয়ের মাঝে তিনটি পার্থক্য বিদ্যমান—

- প্রথম আয়াতের ﴿مِّنْ﴾ এর পরিবর্তে দ্বিতীয় আয়াতে আছে ﴿خَشْيَةَ﴾ শব্দটি।
- প্রথম আয়াতের ﴿نَرْزُقُكُمْ﴾ এর বদলে দ্বিতীয় আয়াতে আছে ﴿نَرْزُقُهُمْ﴾ শব্দটি।
- প্রথম আয়াতের ﴿إِيَّاهُمْ﴾ এর স্থলে দ্বিতীয় আয়াতে আছে ﴿إِيَّاكُمْ﴾ শব্দটি।

তাফসিরের গ্রন্থ খুললে এই অমিলের সূক্ষ্ম কারণ বুঝতে পারবেন। যথা, প্রথম আয়াতে সুরা আনআমে আল্লাহ তাআলা বলছেন 'দারিদ্র্যের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না'—অর্থাৎ তোমরা বর্তমানে দারিদ্র্য ভোগ করছ জানি, কিন্তু এরপরও তোমরা সন্তানদের হত্যা করো না। কেননা, আল্লাহ বর্তমান দুরবস্থায়ও তোমাদের রিজিকের ব্যবস্থা করবেন, সাথে তোমাদের সন্তানদেরও রিজিক দেবেন। আল্লাহ বললেন, ﴿نَرۡزُقُكُمۡ﴾ অর্থাৎ আমি বর্তমান দুর্দশায় তোমাদের রিজিক দিচ্ছি; এরপর তিনি আরও বললেন, ﴿وَإِيَّاهُمۡ﴾ অর্থাৎ তাদেরও রিজিক দিচ্ছি।

কিন্তু দ্বিতীয় আয়াতে সুরা বনি ইসরাইলে আল্লাহ তাআলা বলছেন: 'দারিদ্র্যের আশঙ্কায় তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না'—অর্থাৎ তোমরা বর্তমানে যদিও দরিদ্র নও; বরং সচ্ছল, কিন্তু সন্তান লালনপালন করতে থাকলে ভবিষ্যতে দারিদ্র্য পেয়ে বসবে, এমন আশঙ্কায় তোমরা তোমাদের সন্তানদের মেরে ফেলো না। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আপনাকে নিশ্চিন্ত করছেন, তিনি আপনার আগত সন্তানদের রিজিকের দায়িত্ব নিয়েছেন; আর সেই সাথে আপনাদের রিজিকের ব্যবস্থাও তিনি করবেন। তাই তিনি এই আয়াতে বলছেন, ﴿نَرۡزُقُهُمۡ﴾—অর্থাৎ আমি ভবিষ্যতে তাদের রিজিক দেবো; এরপর তিনি আবার বললেন, ﴿وَإِيَّاكُمۡ﴾ অর্থাৎ সাথে তোমাদেরও।

আয়াতদ্বয়ের তাফসির না জানলে কোন আয়াতের শেষ অংশ কোনটি, তা মনে রাখা কষ্টকর হবে।

২. সুরা বাকারার একটি আয়াত (৫৮) এমন,

﴿وَإِذۡ قُلۡنَا ٱدۡخُلُواْ هَٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَةَ فَكُلُواْ مِنۡهَا حَيۡثُ شِئۡتُمۡ رَغَدٗا وَٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدٗا وَقُولُواْ حِطَّةٞ نَّغۡفِرۡ لَكُمۡ خَطَٰيَٰكُمۡۚ وَسَنَزِيدُ ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾

আবার সুরা আরাফের একটি আয়াত (১৬১) হলো,

﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ ۚ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾

এখানে প্রথম আয়াতের সাথে দ্বিতীয় আয়াতের পার্থক্যগুলো হলো—

- ﴿قُلْنَا﴾ এর বদলে ﴿قِيلَ﴾ এসেছে।
- ﴿لَهُمُ﴾ অতিরিক্ত এসেছে।
- ﴿ادْخُلُوا﴾ এর বদলে ﴿اسْكُنُوا﴾ এসেছে।
- ﴿فَكُلُوا﴾ এর বদলে ﴿وَكُلُوا﴾ এসেছে।
- এখানে ﴿رَغَدًا﴾ শব্দটি নেই।
- ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ শব্দটি ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ এর আগে এসেছে।
- ﴿خَطَايَاكُمْ﴾ এর বদলে ﴿خَطِيئَاتِكُمْ﴾ এসেছে।
- ﴿وَسَنَزِيدُ﴾ এর পরিবর্তে ﴿سَنَزِيدُ﴾ এসেছে।

৩. সুরা আলে ইমরানের একটি আয়াত (১২৬) হলো,

﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾

এদিকে সুরা আনফালের একটি আয়াত (১০) হলো,

﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

এখানে দ্বিতীয় আয়াতের পার্থক্যগুলো হলো—

- এখানে ﴿لَكُمْ﴾ নেই।
- ﴿قُلُوْبُكُمْ بِهٖ﴾ এর বদলে ﴿بِهٖ قُلُوْبُكُمْ﴾ এসেছে।
- ﴿مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ﴾ এর পরিবর্তে ﴿مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ، اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾ আছে।

৪. সুরা নাহলের একটি আয়াত (১৪) হলো,

﴿وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ﴾

আবার সুরা ফাতিরের একটি আয়াত (১২) হলো,

﴿وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ﴾

প্রথম আয়াতের সাথে এখানে দ্বিতীয় আয়াতের পার্থক্যগুলো হলো—

- ﴿مَوَاخِرَ فِيْهِ﴾ এর পরিবর্তে ﴿فِيْهِ مَوَاخِرَ﴾ রয়েছে।
- ﴿وَلِتَبْتَغُوْا﴾ এর বদলে ﴿لِتَبْتَغُوْا﴾ রয়েছে।

৫. সুরা আরাফের একটি আয়াত (১১১) হলো,

﴿قَالُوْۤا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ﴾

এদিকে সুরা শুআরার একটি আয়াত (৩৬) হলো,

﴿قَالُوْۤا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ﴾

এখানে দ্বিতীয় আয়াতের পার্থক্য হলো—

- ﴿وَاَرْسِلْ﴾ এর পরিবর্তে ﴿وَابْعَثْ﴾ শব্দটি এসেছে।

৬. সুরা কাহফের একটি আয়াত (৭৮) হলো,

﴿سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا﴾

সুরা কাহফেরই অন্যত্র (আয়াত: ৮২) এসেছে,

﴿ذٰلِكَ تَأْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا﴾

এখানে দ্বিতীয় আয়াতের পার্থক্যগুলো হলো—

- ﴿سَأُنَبِّئُكَ﴾ এর স্থলে ﴿ذٰلِكَ﴾ এসেছে।
- ﴿بِتَأْوِيْلِ﴾ এর বদলে ﴿تَأْوِيْلُ﴾ এসেছে।
- ﴿تَسْتَطِعْ﴾ এর পরিবর্তে ﴿تَسْطِعْ﴾ এসেছে।

৭. পুরোপুরি মিলে যায় এমন একটি উদাহরণ:

সুরা নামলের একটি আয়াত (৩) হলো,

﴿اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ﴾

এদিকে সুরা লুকমানের একইরকম একটি আয়াত (৪) হলো,

﴿الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ﴾

কুরআনে এমন সাদৃশ্যপূর্ণ আয়াতের সংখ্যা অনেক। দু-হাজারেরও অধিক আয়াত আছে, যেগুলোতে কিছু-না-কিছু সাদৃশ্য বিদ্যমান! এমনকি এরূপ আয়াতগুলোর অনুসন্ধান, পার্থক্য এবং অল্প অমিলের পেছনের কারণ নিয়ে আলাদা অনেক গ্রন্থও রচিত হয়েছে।

এই আলোচনায় আমি দুটি ব্যাপারে সতর্ক করতে চাচ্ছি,

১. হিফজ পূর্ণ করার পূর্বে আয়াতে মুতাশাবিহাতের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত নয়। কারণ, এতে হিফজকৃত অংশগুলোতে বিভ্রাট ও গোলযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

২. অনেক সময় এ প্রকারের আয়াতগুলো সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে নিচের কোনো একটি পদ্ধতির সহায়তা নেওয়া যেতে পারে—

১. المعجم المفهرس للقرآن الكريم (আল-মুজামুল মুফাহরাস লিল-কুরআনিল কারিম) গ্রন্থটির শরণাপন্ন হওয়া।

২. কম্পিউটার সফটওয়্যার বা স্মার্ট ফোনের কোনো অ্যাপ ব্যবহার করা।

৩. দক্ষ হাফেজের দ্বারস্থ হওয়া।

হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা

হিফজকে সুদৃঢ় করার অত্যন্ত কার্যকর মাধ্যম হলো হিফজুল কুরআনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা। কারণ, মানুষের সামনে কোনো পরীক্ষামূলক বিষয় থাকলে স্বভাবতই সে সেখানে চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রচেষ্টা ব্যয়ে উদ্যোগী হয়ে থাকে। ঠিক তদ্রূপ হিফজের ক্ষেত্রেও পরীক্ষার ভাবনা থাকলে, ব্যক্তি দ্রুততম সময়ে এবং সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে তা আয়ত্ত করতে উৎসাহী হবে। দেখুন, আল্লাহ তাআলা বলছেন,

﴿وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾

“এ বিষয়ে (আল্লাহর আনুগত্য) প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত।” [সুরা মুতাফফিফিন: ২৬]

তবে আপনি আপনার নিয়তের প্রতি খেয়াল রাখুন! সর্বদা তাকে ইখলাসমুখী রাখার প্রতি সচেষ্ট থাকুন! পুরস্কার অর্জন বা বিজয়ী হওয়ার কাছে তা বিকিয়ে দেবেন না! বরং নিয়তকে রাখুন পরিষ্কার ও একনিষ্ঠ...।

এভাবে ভাবুন, এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আমি কেবল আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যেই হিফজকে শক্তিশালী করছি।

তবে আনুষ্ঠানিকভাবে বড় পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা যদি না-ও থাকে, তবু সমস্যা নেই। সে ক্ষেত্রে আপনি মসজিদ, কর্মক্ষেত্র, কলেজ-ভার্সিটি, সংস্থা-সংগঠন, এমনকি এলাকাভিত্তিকভাবেও এর আয়োজন করতে পারেন। বিশেষত সে-সব বাচ্চাদের জন্য, যারা পুরস্কার পেলে উৎসাহ বোধ করে...।

সংঘবদ্ধভাবে কয়েকজন মিলে হিফজ করলে পর্যায়ক্রমিকভাবে একে অপরের হিফজ শোনার জন্য সময় নির্ধারণ করে নিতে পারেন। আর যার তত্ত্বাবধানে হিফজের আসর অনুষ্ঠিত হয়, হিফজকারীদের উৎসাহ প্রদান আর হতোদ্যমদের আগ্রহ ফিরিয়ে আনার জন্য তার উচিত তাদের জন্য হালকা ধরনের কিছু আয়োজন-উপহারের ব্যবস্থা করা।

সহায়ক নিয়মগুলোর সংক্ষিপ্ত স্মরণিকা

১. পাঁচ বছরমেয়াদি একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করুন।

২. সংঘবদ্ধ হয়ে শুরু করুন।

৩. একটি ছোট কুরআন সাথে রাখুন।

৪. জাহরি নামাজে ইমামের কিরাআত মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

৫. সহজ অংশ দিয়ে শুরু করুন।

৬. নির্দিষ্ট অনুলিপি ব্যবহার করুন।

৭. হিফজ পোক্ত না-করে সামনে এগোনো থেকে বিরত থাকুন।

৮. নতুন সুরা শুরু করার পূর্বে মুখস্থ সুরাগুলো আলাদা আলাদাভাবে স্মৃতিতে বসিয়ে নিন।

৯. মুতাশাবিহাত (সাদৃশ্যপূর্ণ) আয়াতগুলোর প্রতি মনোযোগ দান করুন।

১০. হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতায় অংশ নিন।

শেষ কথা

প্রিয় ভাই, পুস্তিকাটি সমাপ্ত হওয়ার পথে আপনার নিকট আমি তিনটি নিবেদন জানাতে চাই—

১. আজ থেকেই হিফজ শুরু করে দিন, কালকের আশায় বসে থাকবেন না। 'অচিরেই শুরু করব' বাক্যটি যেন আপনাকে ধোঁকায় না ফেলে!

২. এই বইটির বিষয়বস্তুর প্রচারে অংশ নিন।

হযরত আবু মাসউদ আনসারি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি সৎকাজের পথ দেখায়, আমলকারীর মতো তার আমলনামায়ও প্রতিদান যোগ হয়।"[৫৮]

৩. আল্লাহ আপনাকে হিফজের তওফিক দিলে আপনার দোয়ায় আমাকে ভুলবেন না যেন...! কারণ, আমার জন্য দোয়া করার ফলে আপনি নিজেও অনুরূপ বস্তু প্রাপ্ত হবেন...। যেমন আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে লোক তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দোয়া করে, তার উপর নিয়োজিত ফেরেশতা 'আমিন' বলতে থাকে আর বলে—তোমার জন্যও অনুরূপ হোক...।"[৫৯]

---

[৫৮]. *সহিহ মুসলিম:* ১৮৯৩।
[৫৯]. *সহিহ মুসলিম:* ২৭৩২।

মহান রবের দরবারে আকুতি জানাই, তিনি আমার, আপনার এবং সকল মুসলমানের ভুলত্রুটি মার্জনা করুন! কুরআনুল কারিমকে আমাদের বিপক্ষ না বানিয়ে স্বপক্ষ বানিয়ে দিন! আমাদের তিনি তাঁর সন্তুষ্টিজনক পন্থায় দিবানিশি কুরআন তিলাওয়াতের তওফিক দিন! আর কিয়ামত দিবসে তিনি কুরআনকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী এবং জান্নাতের পথনির্দেশক হিসেবে নির্বাচন করুন!

﴿فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾

"আমি তোমাদের যা বলছি, অচিরেই তোমরা তা স্মরণ করবে। আর আমি আমার সকল বিষয় আল্লাহর কাছেই ন্যস্ত করছি, নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের দেখেন।" [সুরা মুমিন: ৪৪]

—ড. রাগিব সারজানি

গ্রন্থপঞ্জিকা

১। সহিহ বুখারি—দারু ইবনে কাছির, প্রথম সংস্করণ।

২। সহিহ মুসলিম—দারু ইহইয়ায়িল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ।

৩। সুনানে আবু দাউদ—দারুল কেবলা লিস-সাকাফাহ-মুআসসাসাতুর রাইয়ান-আল-মাকতাবাতুল মাক্কিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ।

৪। জামে তিরমিযি—দারুল গারবিল ইসলামি, প্রথম সংস্করণ।

৫। সুনানে ইবনে মাজাহ—দারুল হাদারাতি লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযি, দ্বিতীয় সংস্করণ।

৬। সুনানে দারেমি—দারুল মুগনি লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযি, প্রথম সংস্করণ।

৭। মুসনাদে আহমাদ—মুআসসাসাতুর রিসালাহ, প্রথম সংস্করণ।

৮। আস-সুনানুল কুবরালিন-নাসায়ি—মুআসসাসাতুর রিসালাহ, প্রথম সংস্করণ।

৯। শুয়াবুল ঈমান লিল-বাইহাকি—মাকতাবাতুর রুশদ, প্রথম সংস্করণ।

১০। ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন—দারুল মারিফাহ, প্রকাশকাল-১৯৮২।

১১। আত-তিবয়ান ফি আদাবি হামালাতিল কুরআন লিন-নাবাবি—দারু ইবনে হাযম, চতুর্থ সংস্করণ।

প্রকাশকের প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

কুরআন হিফজ করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মহৎ ও সওয়াবের একটি আমল। এ ব্যাপারে আমরা সবাই কম-বেশি অবগত। একজন হাফেজ শুধু নিজের জন্য নয়, বরং পুরো পরিবারের জন্য হতে পারে নাজাতের মাধ্যম । তাই আমরা উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের সন্তানদের মাদরাসার হিফজ বিভাগে ভর্তি করিয়ে থাকি। এটা অনেক বড় আত্মত্যাগ মা-বাবার জন্য। বিশেষ করে মায়ের জন্য, যিনি সন্তানের মুখ দেখার জন্য হাসিমুখে সহ্য করেছেন গর্ভকালীন অসহ্য যন্ত্রণা, নিজের হাতে খাইয়ে না দিলে যার মন তুষ্ট হয় না, সন্তানের সামান্য সর্দি-কাশিতেই যার দুশ্চিন্তায় ঘুম আসে না। সেই তিনি সন্তানের হিফজের স্বার্থে আবাসিক ব্যবস্থাপনায় ভর্তি করিয়ে দিচ্ছেন ছয়-সাত বছরের শিশু সন্তানকে তার চোখের পানি উপেক্ষা করে।

এবার যদি আমরা একটু অন্যভাবে দেখি, আমরা সন্তানের কল্যাণ ও নাজাতের জন্য তাকে যে হাফেজি মাদরাসায় দিচ্ছি, নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত ইতিবাচক ও জরুরী; কিন্তু কুরআন হিফজ কি শুধুই আমাদের নাবালক সন্তানদের দায়িত্ব, যাদের ওপর শরিয়তের ফরজ হুকুমগুলো এখনো আবশ্যকই হয়নি? আমাদের ওপর কি কুরআন তিলাওয়াত শেখার, হিফজ করার হুকুম বর্তায় না?

হ্যাঁ, বর্তায়, কুরআন হিফজ আমাদের সকলেরই দায়িত্ব। কুরআন সবার জন্য, সর্বযুগে তদ্রূপ এর হিফজকরণও সবার জন্য, সব বয়সীর জন্য। কারণ, জান্নাত প্রাপ্তি ও জাহান্নাম থেকে নাজাত লাভ আমাদের সকলেরই দরকার। নাবালকদের যেমন দরকার, পূর্ণ বয়স্কদের জন্যও তেমন দরকার।

আমাদের সন্তান যদি বুকে কুরআন ধারণপূর্বক হাশরের ময়দানে আমাদের জন্য সুপারিশের মাধ্যমে নাজাতের ওসিলা হতে পারে, তাহলে

যে বয়সেই হোক না-কেন, আমরাও তো সাধ্যমত হিফজ করে আমাদের মা-বাবার জন্য নাজাতের ওসিলা হতে পারি... ।

আরেকটি বিষয় পরিলক্ষিত হয় যে কখনো কখনো সন্তানকে হিফজ বিভাগে দেওয়ার পরও কোনো কারণে সে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না, শেষ করে উঠতে পারছে না পূর্ণ কুরআন শরিফের হিফজ, সামনে বাড়ছে না তার সবক। অভিভাবকরা পেরেশান। ওস্তাদরা পেরেশান। বাড়তি মানসিক

প্রেশারে ছাত্রটি হয়ে যাচ্ছে আরও বিচলিত। অভিভাবকরা হন্যে হয়ে খোঁজ করতে থাকেন আরও ভালো কোন হিফজ মাদ্রাসা বা ওস্তাদের, যেখানে দিলে হয়তো-বা বাবা-মার এতো দিনের লালিত স্বপ্নটি-আশাটি পুরণ হবে...। কেউ কেউ সন্তানের বয়স ৩-৪ বছর হতেই খোঁজখবর নিতে শুরু করেন ভালো হিফজ মাদ্রাসা কোথায় আছে। কিন্তু এখানে ভাবনার বিষয় হচ্ছে, কোন সন্তান তো ৬-৭ বছর থেকে শেখা শুরু করে না, সে তো শিখছে তার মায়ের কোল থেকেই, শিখছে তার মা-বাবা থেকে, পরিবার থেকে। যে পরিবারে কুরআন হিফজের চর্চা নেই, সে পরিবারের সন্তান মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে হাফেজ হচ্ছে, এটা তো এক প্রকার বিশেষ কারামতই বলা যায় তার জন্য, স্বাভাবিক বলা যায় না। একজন ওস্তাদ তখনই স্বাভাবিকভাবে একজন বাচ্চাকে হিফজ করাতে পারবেন, যখন বাচ্চাটি এমন একটি পরিবার থেকে আসবে, যেখানে সে কুরআন হিফজের চর্চা দেখে বড় হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের সন্তানকে কুরআনের হাফেজ বানানোর জন্যও আমাদেরই হিফজ শুরু করাটা জরুরি।

আমাদের দেশে হাফেজি মাদ্রাসা বা হিফজ বিভাগ সব জায়গায় থাকলেও প্রশ্ন হচ্ছে সেখানকার মোট ছাত্র সংখ্যা কেমন? লেখাটি দ্রুত প্রস্তুত করায় কোন পরিসংখ্যান আমি দিতে পারছি না, তবে নিঃসন্দেহে তা আমাদের অন্যান্য যে শিক্ষাব্যবস্থা আছে, সে-সবের তুলনায় অনেক অনেক কম।

আপনি যদি এই বইটি আদ্যোপান্ত পড়ে থাকেন, তাহলে হিফজের গুরুত্ব অনুধাবনের পাশাপাশি নিশ্চয় ভাবছেন, আমাদের সমাজের সে-সব সন্তানদের কথা, যাদের আমরা হয়তো-বা কোনো কারণে মাদরাসায় দিতে পারিনি বা সম্ভব হয়নি। ভাবছেন স্কুল এবং অন্যান্য শিক্ষামাধ্যমে যে বিশাল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে, তারা কীভাবে হিফজ করবে?

সে ক্ষেত্রে সহজ সমাধান হচ্ছে, স্কুল বা অন্যান্য শিক্ষামাধ্যমের কারিকুলামে হিফজ সংযোজন করা। সেটা কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, তার সুনির্দিষ্ট রূপরেখা দেওয়ার যোগ্যতা আমার নেই; তার জন্য অনেক যোগ্য মানুষ এ দেশে আছেন। তবে ড. রাগিব সারজানির স্বদেশ মিশরে আমার দেখা কিছু অভিজ্ঞতা শেয়ার করছি। সেখানকার দ্বীনি শিক্ষার প্রধান মাধ্যম হচ্ছে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশাপাশি রয়েছে মাহাদুল আযহার (আল-আযহার ইনস্টিটিউট), স্কুল পর্যায়ে যা পুরো দেশজুড়ে বিস্তৃত।

এখানে সর্বপ্রথম আছে ইবতেদায়ি (প্রাইমারি/প্রাথমিক লেভেল), যেটির সিলেবাস ছয় বছরে সমাপ্ত। এরপর রয়েছে এদাদি (সেকেন্ডারি/মাধ্যমিক লেভেল), যেটির সিলেবাস তিন বছরব্যাপী। এরপর সানাউইয়া (ডিপ্লোমা বা উচ্চ মাধ্যমিক লেভেল), এটিও তিন বছরব্যাপী। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আছে যথাক্রমে স্নাতক, মাস্টার্স, এমফিল, ডক্টরেট। প্রায় সব গ্রাম বা ইউনিয়ন পর্যায়ে আল-আযহারের এই ইনস্টিটিউট রয়েছে।

ইবতেদায়ির প্রথম বছরের হিফজের সিলেবাসে থাকে ৩০তম পারা, দ্বিতীয় বছরের সিলেবাসে থাকে ২৮ ও ২৯তম পারা, তৃতীয় বছরের সিলেবাসে থাকে ২৫, ২৬ ও ২৭তম পারা, চতুর্থ বছরের সিলেবাসে থাকে ২১, ২২, ২৩ ও ২৪তম পারা, পঞ্চম বছরের সিলেবাসে থাকে ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০তম পারা এবং ষষ্ঠ বছরের সিলেবাসে থাকে ১২, ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬তম পারা।

এদাদি প্রথম বছরের হিফজের সিলেবাসে থাকে ১০ ও ১১তম পারা, দ্বিতীয় বছরের সিলেবাসে থাকে ৭, ৮ ও ৯তম পারা এবং তৃতীয় বছরের সিলেবাসে থাকে ৪, ৫ ও ৬তম পারা।

সানাউইয়া প্রথম বছরের হিফজের সিলেবাসে থাকে ৩য় পারা, দ্বিতীয় বছরের সিলেবাসে থাকে ২য় পারা এবং তৃতীয় বছরের সিলেবাসে থাকে ১ম পারা।

এই হচ্ছে মাহাদুল আযহারের কুরআনের সংক্ষিপ্ত সিলেবাস, যা এর সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্যই বাধ্যতামূলক। পুরো মিশরজুড়ে মাহাদুল আযহারের সংখ্যা প্রায় ১১ হাজার, মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২২ লাখ । অর্থাৎ, আযহার শরিফের বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক লেভেল পাশ করার মাধ্যমেই দ্বীনি ও অন্যান্য শিক্ষার পাশাপাশি পুরো কুরআন শরিফও হিফজ করে ফেলছে । এ ছাড়া, মিশরের সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আড়াই থেকে তিন মাসের মতো গ্রীষ্মকালীন ছুটি থাকে প্রতি বছর। আর এই সময়টিকে শিক্ষার্থীদের কুরআন হিফজের সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করা হয় । এলাকার মসজিদগুলোতে ইমাম সাহেব ও শায়েখগণ এ সময় হিফজের বিভিন্ন দরস ও কোর্সের ব্যবস্থা করেন। কোর্স শেষে হিফজ-প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অভিভাবকদের উপস্থিতিতে প্রায় সবাইকে উৎসাহমূলক পুরস্কার প্রদান করা হয়। এর পাশাপাশি যে-সব

সন্তানের অভিবাবক হাফেজ, তারা নিজ-নিজ সন্তানের হিফজের জন্য নিজেরাও অনেকটা সময় দেন, উৎসাহিত করেন, সন্তানের হিফজের সবক শুনেন নিয়মিত। তাই দেখা যায়, মাহাদুল আযহারের মাধ্যমিক পর্যায়ের পূর্ণ হিফজের কারিকুলাম ১২ বছরের হলেও অনেকেই প্রথম ৫-৬ বছরেই পুরো কুরআন হিফজ সম্পন্ন করে ফেলে।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আল-আযহারের মোট ফ্যাকাল্টি/অনুষদ সংখ্যা ২২টিরও বেশি। এর মধ্যে শুধু দ্বীনি অনুষদ রয়েছে পাঁচটি, এ ছাড়াও রয়েছে মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডেন্টাল, এগ্রিকালচার, ফার্মেসি, বি.বি.এ-সহ অন্যান্য অনুষদ। স্নাতক পর্যায়ে আযহারের সকল অনুষদেই কুরআন হিফজের বিষয়টি বাধ্যতামূলক, শুধু দ্বীনি অনুষদগুলোতেই তা সীমাবদ্ধ নয়। প্রতি বছর কুরআন হিফজের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয় আযহারের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে। চার বছরের ফ্যাকাল্টিগুলোতে মিশরীয়দের জন্য প্রত্যেক বছর প্রায় সাড়ে সাত পারা করে হিফজ করতে হয়। এভাবে চার বছরে পুরো কুরআন শরিফের হিফজ সম্পন্ন হয়। মেডিকেল বা ল'—এরূপ পাঁচ বছরের ফ্যাকাল্টিগুলোর ক্ষেত্রে মিশরীয়দের জন্য প্রতি বছর কুরআন হিফজ করতে হয় ছয় পারা করে। উল্লেখ্য, স্নাতক পর্যায়ের সকলেই যে মাহাদুল আযহার থেকে এসে ভর্তি হন, এমনটি নন। সে ক্ষেত্রে অনেককেই এই পর্যায়ে এসে নতুন করে হিফজ করতে হয়, যদি পূর্বে হিফজ না করে থাকে। ফলে, আযহার থেকে যেমন বের হচ্ছে হাফেজ আলেম, হাফেয কারি, তেমনই বের হচ্ছে হাফেজ ডাক্তার, হাফেজ ইঞ্জিনিয়ার...। তবে অনারব ছাত্রদের জন্য এই হিফজের পরিমাণে শিথিলতা রয়েছে, তাদের মোট চার পারা করে হিফজ করতে হয়—প্রতি বছর এক পারা। এমফিল ব্যতীত আযহারের মাস্টার্স দুই বছরের, সেখানেও মিশরীয়দের হিফজ করতে হয় পুরো কুরআন—প্রতি বছর ১৫ পারা করে। তবে এ ক্ষেত্রেও অনারবদের জন্য শিথিলতা রয়েছে। মোট ছয় পারার পরীক্ষা দিতে হয় তাদের।

আর তাই, বিখ্যাত তাফসিরগ্রন্থ *তাফসিরুল ওয়াসিত*-এর লেখক সাবেক শাইখুল আযহার সাইয়েদ তানতাভি (রহ.) প্রায়ই বলতেন,

ليس ازهريا من لا يحفظ القران অর্থাৎ, যে হিফজ করে না, সে আযহারিই নয়।

এটি হলো মিশরের শিক্ষাব্যবস্থার একাংশের চিত্র। কিন্তু অনেক মিশরি ব্যক্তি আছেন, যারা আযহারের কোনো মারহালা বা পর্যায়ে অধ্যয়ন করেননি, কিন্তু কত গুরুত্ব প্রদান করেন কুরআন হিফজের...; বিশেষ করে রমজানে যেন কুরআন হিফজ ও তিলাওয়াতের মওসুম শুরু হয় পুরো দেশজুড়ে। দোকানে, অফিসে, রেস্তোরায় যখনই সুযোগ পাচ্ছেন, তিলাওয়াত করছেন—এমনকি সিট না পেয়ে বাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াতেও কারও ক্লান্তি নেই যেন...। একটুখানি ট্র্যাফিক সিগনাল পড়েছে, অমনি গাড়ির চালক হয়তো খুলে বসলেন ড্যাশবোর্ডে রাখা কুরআন। আমি অনেককেই জিজ্ঞেস করেছি, আপনারা রমজানে কি কুরআন খতম করেন, কিন্তু এই প্রশ্নে তারা বিস্ময় প্রকাশ করত। ব্যক্তিগতভাবে কুরআন খতম করার কী আছে? কুরআন তো হিফজ করার বিষয়, বোঝার বিষয়, আমল করার বিষয়। খতম তো তারাবি বা কিয়ামুল লাইলে দেওয়া হয়, জামাতের সাথে...। মিশরের প্রায় মসজিদেই ফজরের নামাজের তিলাওয়াতের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে কয়েক মাসে কুরআন খতম দেওয়া হয়। আবার ফজরের পর কিছু মুসল্লি কুরআন মশক করেন এবং ধারাবাহিকভাবে কুরআন খতম করেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, আমাদের দেশেও ধীরে ধীরে কুরআন হিফজের ব্যাপারে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন আসছে। কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে, যারা স্কুল পড়ুয়া ছাত্রদের হিফজের জন্য কাজ করছেন। পাশপাশি, গড়ে উঠছে এমন কিছু আবাসিক তাহফিজুল কুরআন মাদ্রাসা, যা শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ।

আমরা সমাজের যে যেই অবস্থানেই আছি, সেখান থেকে যদি আল্লাহর পবিত্র কালাম আত্মস্থ করার নিয়ত করি, তাহলে একদিন সকল কারিকুলামে তাহফিজুল কুরআন অন্তর্ভুক্তিসহ কাঙ্খিত পরিবর্তন আসবেই। প্রচলিত হিফজ বিভাগের হাফেজগণও একদিন হাফেয হওয়ার পাশপাশি ডাক্তার হবেন, ইঞ্জিনিয়ার হবেন, একাউন্টেন্ট হবেন। অপরদিকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারগণও হতে পারবেন সম্মানিত হাফেজ সাহেব—ইনশাআল্লাহ ।

—মোঃ রাকিবুল হাসান খান